মৃণাল সেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির নিবেদন

জন্মশতবর্ষে মৃণাল সেন

সহযোগিতায় বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান

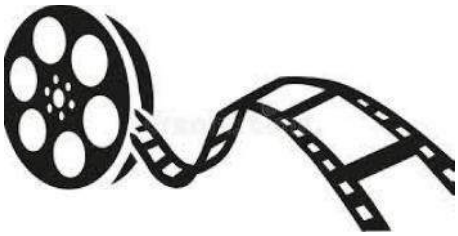

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন-এর শতবর্ষ পূর্তিতে ১৬ ও ১৭ মার্চ ২০২৪ দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে বর্ধমানের চলচ্চিত্র অনুসন্ধিৎসু মানুষজন যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি আপ্লুত।

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সকলকে।

বর্ধমানবাসী যে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে দায়বদ্ধ একথা আবার প্রমাণিত হল।

প্রকাশক : মৃণাল সেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

সম্পাদনা : ডঃ সুকৃতি ঘোষাল
বিধান রায়
তারকনাথ দত্ত

তারিখ : ১৬ মার্চ, ২০২৪

প্রচ্ছদ : শ্যামলবরণ সাহা

মুদ্রণ : পি. ডি. গ্রাফিক্স সলিউশন
বর্ধমান
মোঃ- ৯৬৪৭৬৮১৩৯৭ / ৮২৯৩৩২২০১৪

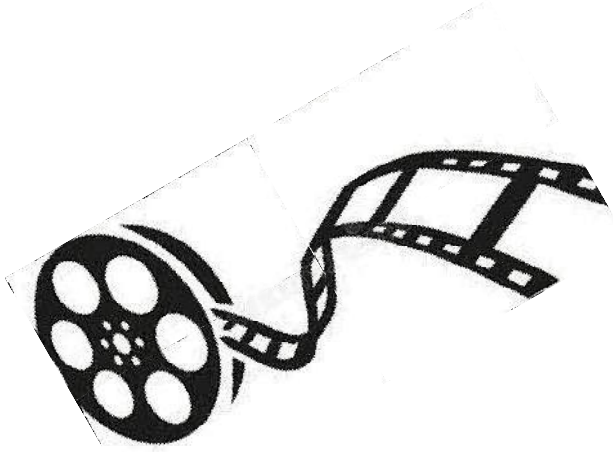

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলচ্চিত্র
শিল্প – সাহিত্য – সংস্কৃতি
ও সমাজমনস্ক
যে সব মানুষদের
হারিয়েছি
কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের
স্মরণ করি ।

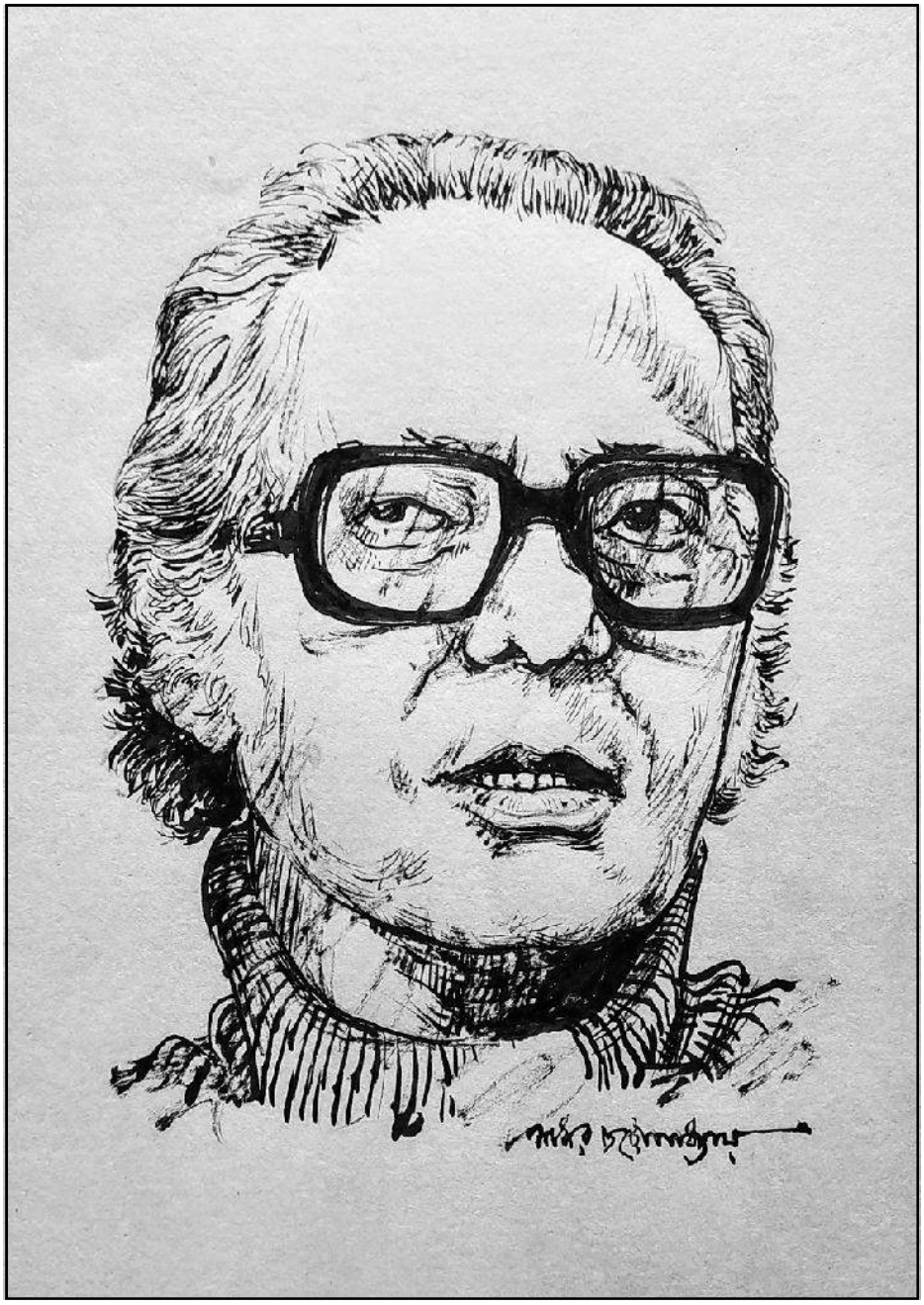

স্কেচ : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

সময়টা বিগত শতকের আটের দশকের মাঝামাঝি। মৃণাল সেনকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্রের কাজ চলছে। ক্যামেরার সামনে তিনি সরাসরি বলছেন, "আমি প্রায় এক কোটি কলকাতাবাসীর মধ্যে একজন। আমার নাম মৃণাল সেন। কলকাতা সেই শহর যে সবসময় অশান্ত প্রাণবন্ত রাগী প্রতিবাদী অনিশ্চিত। এই শহর আমাকে উত্তেজিত করে...''।

দেশভাগ, উদ্বাস্তুস্রোত, কর্মহীনতা, পুরনো মূল্যবোধের সঙ্কট। সেই সময় কলকাতায় তাঁর মননের সমৃদ্ধি। স্কটিশচার্চ কলেজে পরিচয় সমাজবদলের নতুন মতাদর্শের সঙ্গে। কলেজ সংলগ্ন হাজরা মোড়ের প্যারাডাইস কাফের আড্ডায় ঋত্বিক ঘটক, তাপস সেন, সলিল চৌধুরী, হৃষীকেশ মুখার্জী, বংশী চন্দ্রগুপ্তদের সান্নিধ্য। নতুন ভাবনার 'জেনেসিস'। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তখন এক ফলবান বেলা। একদিকে কফিহাউসের উদ্দাম আড্ডা, নতুন নতুন সমাজভাবনা। হেমাঙ্গ-সলিলের গণসঙ্গীত, জর্জ বিশ্বাস হেমন্ত মুখার্জীর রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবিশঙ্কর-আলি আকবরের যুগলবন্দি, উদয়শঙ্করের নৃত্য, খালেদ চৌধুরীর রংতুলি, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ উৎপল দত্তের মঞ্চ কাঁপানো প্রযোজনা, কলকাতার আনাচে কানাচে গোর্কির 'মা' কে ঘিরে চরম উন্মাদনা। আরও আরও নতুন নতুন নানা সাংস্কৃতিক উপাদান যা মৃণাল সেনকে আক্ষরিক অর্থেই 'উত্তেজিত' করছিল।

গত শতকের ছেচল্লিশের প্রথম দিকে 'Cinema and the People' প্রবন্ধে মৃণাল সেন লিখেছেন 'people' ছাড়া তখন কিছু ভাবতে পারতাম না। হ্যাঁ, এই 'people' ই তাঁর সিনেমার মূল উপাদান। কিন্তু কোন মানুষ? কোন জন-অংশ? অধিকার বঞ্চিত, প্রান্তীয় অবস্থানে থাকতে বাধ্য মানুষ। আরো স্পষ্ট করে বললে, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ। মধ্যবিত্ত মানুষকে সমগ্র জীবনবৃত্তে ধরতে চেয়েছেন মৃণাল সেন। তার জীবন সংগ্রাম, পলায়নী মানসিকতা, মিথ্যার আশ্রয়, সুবিধাবাদ, দ্বন্দ্ব, সমঝোতা, আত্মসমর্পণ -- সবই তাঁর সেলুলয়েডে উঠে এসেছে অনায়াস দক্ষতায়। সময়ের আবর্তে ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব কতখানি এবং কীভাবে শ্রেণিদ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয় তা রেখাঙ্কিত হয়েছে মৃণালের সিনেমায়। পাশাপাশি উচ্চবিত্তের দম্ভ, ফাঁপা আত্মগর্বকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। সর্বোপরি 'ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট আশা'-রও হদিশ দিয়েছেন পরম মমতায়।

সমাজসঙ্কটের ব্যাখ্যান-উপস্থাপনে একটা পরিশীলিত বাম দৃষ্টিকোণ থাকলেও মৃণাল সেনের সৃষ্টি নিছক রাজনৈতিক ইশতেহার কিংবা উচ্চকিত স্লোগান বলে ভাবা অনুচিত। ধ্যান দিয়ে দেখলে তাঁর চলচিত্রের বহুমাত্রিকতা, বহুস্তরীয় ব্যঞ্জনা আমাদের নজর এড়ায় না। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অভিঘাত সংসারের প্রেমশিখাটিকে কখনো দুলিয়ে দেয়, নিরন্ন মানুষের কঙ্কালসার চেহারা দুর্ভিক্ষের চলচ্চিত্রায়নকে শৌখিন বিলাসিতা করে তোলে। আবার নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সম্মিলিত বিক্ষোভ সংগঠিত হয়, মানুষ প্রতিবাদী হয়ে অবস্থার বদল ঘটায়। এসব উপলব্ধি মৃণাল আমাদের উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পেরেছেন, নিজস্ব ভঙ্গিতে। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। 'ভুবন সোম' থেকে 'মৃগয়া', 'একদিন প্রতিদিন', 'খারিজ' হয়ে 'আমার ভুবন' -- মৃণাল নিজেকে বদলেছেন, কারণ তিনি সন্ধান করতে চেয়েছেন, প্রচার করতে চাননি। সে সন্ধানের শৈল্পিক ও সামাজিক মূল্য নিয়ে গবেষণা হবে, বিতর্ক হবে, নতুনভাবে চর্চিত, মূল্যায়িত হবেন মৃণাল সেন। তাঁর জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে সমস্ত কর্মকাণ্ডের সেটাই মূল উদ্দেশ্য। আমরা মৃণালকে, তাঁর ছবিকে সামনে রেখে যেন প্রশ্ন করে যেতে পারি, যেমনটা করি সত্যজিৎ বা ঋত্বিকের ছবি নিয়ে। মৃণাল যেন বিস্মৃত না হন, তাতে সামনে চলার পথ খোঁজ আরো কঠিন হবে। আজকের এই খণ্ডচৈতন্যের যুগে মৃণালযুগের যৌথভাবনার ফসলগুলোর মূল্যায়ন খুবই জরুরী মনে হয়।

বিষয়সূচী

মৃণাল সেন ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব	:	বিভাস সাহা	৯
পাশ থেকে দেখা	:	গীতা সেন	১৪
মৃণাল সেন নিজের কথায়, স্মৃতিতে, সত্তায়	:	শিবাদিত্য দাশগুপ্ত	১৯
মৃণাল সেন এবং তাঁর চলচ্চিত্র উত্তরাধিকার সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের যুদ্ধে কেন আমাদের খড়কুটো?	:	সংহিতা সেন	২২
মৃণাল সেন ও তাঁর পারিপার্শ্বিক	:	দেবেশ ঠাকুর	২৫
অসাধারণকে বোঝার সাধারণ প্রয়াস	:	তমালী নিয়োগী	৩৯
স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ঃ মৃণাল সেন	:	সঙ্গীতা মজুমদার	৪৩
List of Members of Mrinal Sen Birth Centenary Celebration Committee	:		৪৮
উপসমিতি	:		৫১

খারিজ : মমতাশঙ্কর ও অঞ্জন দত্ত

মৃণাল সেন ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব

বিভাস সাহা

মৃণাল সেনের সিনেমা নিয়ে লিখতে গেলে তাঁর সমকালীন দুই মহারথীর সঙ্গে একটা তুলনা এড়ানো যায় না। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে জীবনের কিছু শাশ্বত প্রশ্ন তুলে গেছেন। ঋত্বিক ঘটক দেশভাগ নিয়ে, উদ্বাস্তু জীবনের মরণ বাঁচন সমস্যা নিয়ে বারবার আমাদের নিঃস্পৃহতাকে আঘাত করেছেন। এই দুই পাহাড়ের মাঝে মৃণাল সেন এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা। তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অনুচ্চারিত অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভাঙার কথা লিখে গেছেন। এই উপত্যকায় রয়েছে আমাদের অতি পরিচিত ঘর বাড়ি, পাড়া, বাজার, আমাদের আন্দোলন, সংগ্রাম, মিটিং মিছিল, জয় পরাজয়ের নিজস্ব পৃথিবী।

পাঠক, একটা সরলীকরণের জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সত্যজিৎ তাঁর কলকাতা ট্রিলজি-তে (প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ, ও জনঅরণ্য) এবং 'মহানগর'-এ মধ্যবিত্ত বাঙালির আর্থিক ও মানসিক সংকটের কথা বলেছেন। মহানগরে যেখানে আরতি (মাধবী মুখারজী/চক্রবর্তী অভিনীত) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চাকরি ছেড়ে দেয়, জন অরণ্যে সোমনাথ (প্রদীপ মুখারজী অভিনীত) সেখানে টেন্ডার পাস করাতে বন্ধুর বোনকে অফিসারের ঘরে পৌঁছে দেয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এই আত্মগ্লানিময় অবনমন আমরা আর কোথায় দেখেছি?

একটু ভুল হল। দেখেছি আর এক জায়গায়। 'সুবর্ণরেখা'-য় ঈশ্বরচন্দ্র (অভি ভট্টাচার্য) যখন হরপ্রসাদের (বিজন ভট্টাচার্য) সঙ্গে কলকাতায় ফুর্তি করতে আসে ('যাবা নাকি কলকাতায়? সেখানে কত মজা!') তখন সে পতিতার সন্ধানে যার কাছে এসে পৌঁছায় সেই মেয়েটি তো তাঁরই নিজের বোন, যাকে সে নীচু জাতের ছেলেকে বিয়ে করার জন্য পরিত্যাগ করেছিল। আপনারা জানেন, ভাই ও বোনের মধ্যে এই আকস্মিক সাক্ষাতের দৃশ্যটি ঋত্বিক যেভাবে রূপায়ন করেছেন তা ভারতীয় তো বটেই, বিশ্বচলচ্চিত্র ইতিহাসেও বিরল।

কিন্তু ঋত্বিকের সিনেমায় মধ্যবিত্ত জীবনের এই সংকট ওতপ্রোত ভাবে দেশভাগের সঙ্গে জড়িত। সত্যজিৎ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করলেও তাঁর আগ্রহ চিরন্তন কিছু প্রশ্নে—শাখা প্রশাখা, ঘরে বাইরে, আগন্তুক ইত্যাদি।

মৃণাল সেন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকে দেখেছেন এক মধ্যবিত্ত হিসেবেই। মনে রাখা উচিত সত্যজিৎ ও ঋত্বিক দুজনেই এসেছিলেন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে। মৃণাল এসে ছিলেন একশভাগ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। কলকাতায় তাঁর আসা শিক্ষা ও চাকরির খোঁজে, উদ্বাস্তু হিসেবে নয়। তবু দেশভাগের কারণে তিনি দেশে ফিরে যেতে পারেননি, তাই তাঁকে বহিরাগতের মত ছোট্ট এক কামরা দু-কামরার ঘরে জীবন কাটাতে হয়েছে দীর্ঘদিন। তিনি কলকাতা তথা নগরকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে বুঝেছিলেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত ছিল স্বপ্নাতুর। 'আকাশ কুসুম' ছবিটির কথা বিশেষ ভাবে বলতে হয়। ছবির শুরু হয় একটি বিয়েবাড়িতে, অজয় (সৌমিত্র অভিনীত) ও মণিকার (অপর্ণা সেন) আলাপের মধ্য দিয়ে। অজয় শখের গায়ক; জলসায় গান গায়, তাতে রোজগার কিছু হয় না। শুধু অনুরাগীদের প্রশংসা মেলে। তাই অজয় ব্যবসায় নামতে চায়। সেখানে অনেক টাকা। কিন্তু অজয় নিজে ব্যবসার কিছু বোঝে না, সে এক মিডলম্যানের উপর নির্ভর করে, ইতিমধ্যে কিছু লোকসানও হয়েছে। কিন্তু সে তবু স্বপ্ন দেখে তার একদিন অনেক টাকা হবে।

অজয় শুধু যে স্বপ্ন দেখে তাই নয়, সে নিজের দারিদ্রকে ঢাকার জন্যে অনেক মিথ্যা কথাও বলে। যেমন মণিকাদের বাড়ি যাওয়ার প্রথম দৃশ্যটি। মণিকারা অত্যন্ত বড়লোক এবং সংস্কৃতিবান। মণিকার মা এবং মণিকা - দুজনেরই অজয়কে খুব পছন্দ। তারা ভাবতেই পারে না, যে এত সুন্দর গান করে, যাকে এত সুন্দর দেখতে সে কখনো টালির ঘরে বাস করতে পারে, বা কর্পোরেশনের জল ধরে চান করে। মণিকাদের বাড়ি বিশাল, গাড়ি আছে, চা খাওয়ার জন্য আলাদা বারান্দা আছে। বাড়ির চাকর ট্রলি করে করে চা আনে। অজয় এই পৃথিবীতে উন্নীত হতে চায়। সে নিজের দারিদ্রকে ঢাকতে বন্ধুর ফোন নম্বরকে নিজের বলে চালায়। বলে, সে সম্প্রতি ফ্ল্যাট বদল করেছে, ব্যবসা নিয়ে সে খুব ব্যস্ত।

মৃণাল সেন এখানে দুটি বিপরীত পৃথিবীর দুই প্রতিনিধিকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। একজন সফল, সে (অর্থাৎ মণিকার বাবা) জানে কীভাবে সফল হতে হয়, তারজন্য কীরকম মেধা লাগে, কীরকম উদ্যোগ ও তৎপরতা দরকার। অন্যজন ওই আর্থিক সফলতার স্বপ্ন দেখে। তার জন্যে দালালের খপ্পরে পড়ে। সে বুঝতে পারে না, অসংগঠিত ব্যবসার পৃথিবীটি নানারকম প্রতারণায় ভরা, বড় ব্যবসা ছোট ব্যবসাকে গিলে ফেলছে। এসব বোঝার তার বিশেষ আগ্রহও নেই। সে শুধু আকাশ কুসম দেখে।

দুই পৃথিবীর মধ্যে সংযোগটি সাংস্কৃতিক,—রবীন্দ্রসঙ্গীত। অজয়ের কাছে মণিকা যেমন আকাশ কুসুমের একটি অংশ, মণিকার কাছে (এবং তার মায়ের কাছেও) অজয়ও এক অর্থে একটি আকাশ কুসুম। অজয়ের মতো এমন

সুন্দর কথা বলে, সুদর্শন, রুচিশীল এমন মানুষ পুরুষ তাদের সফল পৃথিবীতে সে এখনো দেখেনি। অজয়কে সহজেই পাওয়া যাবে, কিন্তু অজয়কে পেলে যে বিফল পৃথিবীর একটা অংশকেও নিতে হবে তা মণিকা এখনো জানে না।

অজয় একের পর এক মিথ্যা সাজিয়ে মণিকার মনের মধ্যে যে কল্পনার রাজ্য গড়ে তুলেছে, তা প্রায় অন্যায়, নিষ্ঠুরতার সামিল। স্বপ্ন অজয়কে হৃদয়হীন করে তোলে। একের পর এক লোকসান খেতে খেতে সে একদিন মায়ের শেষ সঞ্চয়টুকু চেয়ে বসে। মা যখন অনেক আপত্তির পর তার শেষ সম্বলটুকু চেকে লিখে দেয়, তখন অজয় মাকে বলে, ''মা, তুমি কেন এখনকার কথা ভেবে এতো ভয় পাও বোলো তো? একটু পরের কথা ভাবতে পারো না!... ভাবো না, একটা ফোর রুম ফ্ল্যাট, বসার ঘর, তাতে বেঁটে বেঁটে চেয়ার থাকবে। তোমার একটা ঘর হবে, খাট আলমারি, পাশে ছোট্ট একটা পুজোর জায়গা। ... বাড়িটাতে অনেক রোদ্দুর আসবে, এরকম এখানের মতো স্যাঁতসেঁতে নয়।..." (১ ঘন্টা ৮ মিনিটের মাথায় এই দৃশ্যটি আছে।) অসাধারণ একটি সিকোয়েন্স।

অজয়ের এই স্বপ্ন যে কোন মধ্যবিত্তের স্বপ্ন। শুধু সমস্যা হল, এই স্বপ্নটা সফল করার কোন রাস্তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু রাস্তা বলে কিছু একটা আছে, কারণ রাস্তার ওপারে যারা পৌঁছেছে তাদের আমরা দেখতে পাই।

মণিকা ওইখানে দাঁড়িয়ে, ওই সফল পৃথিবীতে। একদিন সে জানতে পারবে অজয় বিফল পৃথিবীর মানুষ, অজয় কোনদিন সফল হতে পারবে না। ছবির শেষ দৃশ্যে দুজনে দুজনকে হাত নাড়ে; তারা জানতে পেরেছে এই দুটো ভিন্ন পৃথিবী কখনো এক হবে না।

মৃণাল সেন বাঙালির অবাধ্য স্বপ্নবিলাসিতার কথা অত্যন্ত সমবেদনার সাথে দেখিয়েছেন। ছবিটি ১৯৬৫ সালে তৈরি, ওই একই সময়ে সত্যজিতের চারুলতা (১৯৬৪) এবং ঋত্বিকের সুবর্ণলতাও (১৯৬৫) তৈরি হয়েছিল। ভেবে দেখুন সিনেমার জগতে একটা কী মাহেন্দ্রক্ষণ!

যদিও খুব মামুলি একটা গল্প নিয়ে মৃণাল সেন সিনেমাটি করেছিলেন তবুও দেখা যায় ওই সময়েই তিনি ক্যামেরা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, যেমন মাঝে মধ্যে ফ্রিজ শট ব্যবহার করছেন। আচমকা সংলাপ বন্ধ করে সাউন্ড ট্র্যাকে পাশ থেকে কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এই শৈলী তিনি অনেক বেশি করে ব্যবহার করেছেন পদাতিক, কলকাতা ৭১, ইন্টারভিউ এবং কোরাস সিনেমায়, যেগুলি ওই সময়ের উত্তাল কলকাতার ছবি। ফরাসি রাজনৈতিক সিনেমার ধাঁচে এখানে তিনি রাস্তায় নেমে সিনেমার ভাষা নিয়ে অনেক ভাংচুর করেছেন।

অন্যদিকে তিনি আবার হিন্দি ভাষাতেও (তেলেগুতেও) ছবি করেছেন। ভুবন সোম তাঁর এক অনন্য সৃষ্টি, একটি কবিতা বলা যেতে পারে। হিন্দি ছবির জগতে ভুবন সোম, মৃগয়া এবং খন্ডহর তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি।

কিন্তু এই সিনেমাগুলির আলোচনা এখানে স্বল্প পরিসরে করা অন্যায়। বরং ফিরে আসি তাঁর প্রিয় বিষয়ে – কলকাতা এবং কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন।

১৯৬০-এর দশক যেমন বাঙালির স্বপ্ন দেখার দশক, তেমনি একই সঙ্গে বিপ্লব বিদ্রোহের দশক। বামপন্থী রাজনীতির উত্থান ও প্রসার। খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল হয়ছিল কলকাতা। পুলিশের গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল কলকাতা। তারপর বামপন্থী শিবিরে ভাঙন, নকশালবাড়ি। দিকে দিকে রাজনৈতিক হত্যা। ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা। বাঙালির স্বপ্ন দেখা শেষ।

সত্তরের শেষ থেকে পুনর্গঠন। বামপন্থী রাজনীতির হাত ধরেই। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর বাঙালি বুঝে গেছে, তাদের অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। শুধু তাই নয় বহু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির জন্য অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরে,

যেমন একটা সাধারণ চাকরি, সাধারণ বিয়ে, সাধারণ সংসার। এসব হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। বিদ্রোহ বিপ্লব থেকে আস্তে আস্তে সে আত্মসমীক্ষায় ঢুকে গেল।

মৃণাল সেন তাই বোধহয় ফিরে এলেন আবার মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে, একদিন প্রতিদিন, আকালের সন্ধানে এবং খারিজ নিয়ে। এ যেন বৃত্ত সম্পূর্ণ করার প্রয়াস। খারিজে গৃহভৃত্য পালান (বয়সে নাবালক) কারবন মনোঅক্সাইডে মারা যাচ্ছে। অল্পবয়সী গৃহকর্মী মধ্যবিত্ত পরিবারে বেশ একটা লাভজনক প্রস্তাব। কিন্তু তাকে রান্নাঘর ছাড়া অন্য কোথাও শোয়ার ব্যবস্থা করা যায় না। অর্থাৎ কারবন মনোঅক্সাইডের ঝুঁকি এড়ানো যাবে না, আবার পালানের রোজগার তার পরিবারেরও খুব দরকার। তাই পালানের মৃত্যু অনিবার্য না হলেও, কেউ দায়ী নয়- এমনকি সমাজ বা রাষ্ট্রও নয়। একথা সবাই আস্তে আস্তে মেনে নেয়, এমনকি পালানের বাবাও।

খারিজে অঞ্জন-মমতার আত্মদংশন আমাদেরও আঘাত করে। আমরা কেউই চাই না, গৃহকর্মীর মৃত্যু হোক। কিন্তু তাকে সুরক্ষা দেওয়ার মত সামর্থ্য আমাদের নেই। মধ্যবিত্ত সমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরন্তন।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি অনবদ্য ছবি একদিন প্রতিদিন। চিন্ময়ী সেনগুপ্ত (মমতাশঙ্কর অভিনীত) অফিস থেকে ফিরছে না। ছোট ভাইয়ের আচমকা মাথা ফাটার দুর্ঘটনার ভিতর দিয়ে বিকেল টুকুস করে সন্ধে হয়ে গেল, তারপর সন্ধে গড়িয়ে রাত, এবং আস্তে আস্তে রাত দুপুর। সিনেমার একবারে প্রথম দিকে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে থাকা অবস্থায় ছোট ভাই শুরু করে, দিদি এখনো এলো না! তার মুখ থেকেই আমরা জানতে পারি একটা মেয়ে এখনো বাড়ি ফেরেনি।

তারপর...

''চিনুর এতো দেরি হচ্ছে কেন?''

''ও শ্রীরামপুরে যায়নি তো?''

''গেলেও তো বলে যাওয়া উচিৎ।''

''সব সময় কি সবকিছু বলে যেতে হবে নাকি?''

''তোরা একটা কিছু করা।''

''আমরা কী করবো?'' ....

মা বাবা মেজ মেয়ে (মিনু)- এদের মধ্যে উদ্বেগের কথোপকথন থেকে আস্তে আস্তে একটা কানাঘুষো প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়ায়। এক ভঙ্গুর অতি প্রাচীন বাড়ির সতেরটি ঘরে বাস করা এগারটি পরিবার থেকে কেউ কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়, কেউ কেউ ঘরের মধ্যে ফিসফিস করে। তারপর থানা পুলিশ, হাসপাতাল, মর্গ। মধ্যরাতের কলকাতা যেন অপঘাতে মৃত বা নিরুদ্দিষ্ট মানুষের খোঁজে আকুল স্বজনের হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ানোর শহর।

মৃণাল সেন ছবিটিকে তিনটি সমান্তরাল অংশে বা ব্লকে ভাগ করেছেন। হৃষীকেশ সেনগুপ্তের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগজনক অপেক্ষা, তাদের কথোপকথন এই নিয়ে একটি অংশ (এটিই প্রধান অংশ); এখানে সংলাপ ছাড়া সাউন্ড ট্র্যাক প্রায় নীরব (মাঝে মাঝে একটা ঘড়ির টিক টিক শব্দ), একটা অস্থির নিঃশব্দতা। দ্বিতীয় অংশটি প্রতিবেশীদের নিয়ে, সেখানে একই সঙ্গে সহানুভূতি এবং নিন্দা করার প্রবণতা। আর তৃতীয় অংশটি হল বাইরের শহর, থানা পুলিশ, হাসপাতাল। এই তৃতীয় অংশে আমরা প্রচুর পারিপার্শ্বিক কর্কশ আওয়াজ শুনতে পাই,

যেমন থানা বা হাসপাতাল যাওয়ার সিকোয়েন্সগুলি। এখানে আমাদের হৃদপিণ্ডের আওয়াজ বাড়তে থাকে, কী হবে, কী হবে এমন একটা ভাব। এই সিকোয়েন্স গুলি থেকে আবার কাট করে ক্যামেরা যখন ঘরের নীরবতায় ফিরে আসে তখন স্নায়ু শান্ত হয়।

কিন্তু এখানে অন্য একটা দ্বান্দ্বিক জগত। মা ও মিনুর মধ্যে পরস্পর দোষারোপ চলতে থাকে, বাবা হৃষীকেশ অসহায়। প্রত্যেকের মধ্যে রাগ ও দুঃখের একটা যাতায়াত চলতে থাকে।

চিন্ময়ী একসময় ফেরে; তখন অনেক অনেক রাত। মুহূর্তের মধ্যে মা, ভাই ও বাবার গলার সুর বদলে যায়। একটু আগেও যারা চিন্ময়ীর মৃতদেহের সন্ধানে মর্গে গিয়েছিল তারাই এখন তাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, যেন জীবিত ফিরে আসাটা ভীষণ গর্হিত।

উঠনে দাঁড়িয়ে চিন্ময়ী। দরজা খুলেছে ছোট বোন রুনু। রুনু দিদির কাছ থেকে সরে এসে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই সরে যাওয়ার মধ্যে একটা আভাস আছে। তার মুখে দিদি ফিরে আসার কোন আনন্দ নেই।

মাঃ (চিন্ময়ীর উদ্দেশ্যে) ''বাইরে দাঁড়িয়ে আর লোক হাসাতে হবে না, রুনু আয়'' (রুনুকে নিয়ে মা ঘরে ঢুকে যায়) ভাইঃ ''দিদি, ঘরে আয়।'' (বারান্দায় দাঁড়িয়ে) বাবাঃ ''যা, ভেতরে যা'' (উঠোনে চিন্ময়ীর পাশে দাঁড়িয়ে)

আস্তে আস্তে প্রতিবেশীদের সন্দিগ্ধ চোখ জ্বলে উঠেতে থাকে। বাড়িওয়ালা এসে বলে, ''এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, এখানে থাকলে ভদ্রলোকের মতো থাকতে হবে।'' একপ্রস্থ বিবাদ উত্তেজনা ছড়ায়, হাতাহাতি অবধি হয়। তারপর সেনগুপ্ত পরিবারের সবাই আবার একত্র হয়, যৌথ অসহায়তার মধ্যে তাড়া এক অপরকে আঁকড়ে ধরে। এভাবেই তারা বেঁচে থাকবে, একদিন প্রতিদিন।

মৃণাল সেন বাঙালির এই ফাঁদবন্দী অবস্থার কথা বলে গেছেন। এখান থেকে কারো মুক্তি নেই। সামান্য রুটিন থেকে এদিক ওদিক করলেই বিপদ। একটু জল বেশি খরচ করলে, অন্যের অসুবিধা, রাতে বেশিক্ষণ লাইট জ্বালিয়ে বই পড়লে বাড়িওয়ালা রেগে যায়, আবার অবিবাহিত মেয়ে অফিস থেকে অক্ষত অবস্থায় দেরি করে ফিরলে কুখ্যাতির কালিমা লাগে সবার গায়ে। এ তো আমাদের নিজেরই সৃষ্টি করা এক অদৃশ্য ফাঁদ।

সেদিন দুজনে : গীতা সেন ও মৃণাল সেন

পাশ থেকে দেখা

গীতা সেন

সেটা '৪৬ সাল হবে। আমার বয়স তখন ১৬ বছর। আমাদের উত্তরপাড়ার বাড়িতে খুবই অসুস্থ অবস্থায় বাবা একদিন বারান্দায় বসে আছেন, এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁকে আমরা চিনি, তিনি একটু আধটু গান চর্চা করেন।

সেই ভদ্রলোক বাবাকে বললেন– একটা গ্রুপ, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার, তারা একটা ছবি করছে। তাতে পনেরো-ষোল বছরের মেয়ের একটা চরিত্র আছে, যদি আপনার মেয়ে করে সেটা.....

প্রথমে তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের বাড়ি থেকে সিনেমা করার কথা ভাবাই যেতনা। কিন্তু সেই ভদ্রলোক বাবাকে বললেন– গ্রুপের লোকেরা একদিন আসবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে। একটা কথা আমি বলতে পারি এঁরা সবাই নতুন আর সবাই খুব ভাল। পরে একদিন সকাল ন'টা বা দশটার সময় জনা পাঁচেক ভদ্রলোক এলেন। তার মধ্যে সকলেই মোটামুটি চল্লিশ পার করা মানুষ। একজনই একটু যুবক। ওঁরা কথাবর্তা বলে চলে গেলেন। সেই যুবকই মৃণাল সেন। উনি কি করে সেই দলটার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। 'দুধারা' বলে যে গল্প নিয়ে ছবিটা হচ্ছিল, সেটা ছিল মৃণালবাবুর লেখা। ঘটনাটার একমাসের মধ্যেই বাবা মারা গেলেন। তখন ওঁরা আবার এলেন আমাদের বাড়িতে। ওঁদের পরামর্শে এবং অনেকটা সংসার চালানোর জন্যই আমি ছবিটাতে অভিনয় করতে শুরু করলাম।

আস্তে আস্তে দলের সকলের সঙ্গে পরিচিতি হল। তখনই বুঝতে পারতাম আমি যেমন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছি, মৃণালবাবুও তাই। সবার চেয়ে ছোট বলেই হয়ত দলের সবাই খুবই ভালবাসত। কিন্তু অচেনা জগতের মধ্যে নতুন আমি খুব কাঁদতাম। ওটাই তখন ছিল আমার অভ্যাস।

তখনই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন রিহার্সাল চলতে রাত প্রায় আটটা হয়ে গেল। ভবানীপুরে একটা বাড়িতে রিহার্সাল হত। রোজ রাতে ফেরার সময় দলের কেউ আমাকে হাওড়া যাবার বাসে তুলে দিতেন, কিন্তু বাসে উঠলে কেউ আর সঙ্গে থাকত না। আবার হাওড়া স্টেশনে দাদা বা কাকা কেউ অপেক্ষা করতেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সাতটা বারো-র একটা ট্রেন ধরে ফিরতাম আমরা। সেদিন অত দেরি হয়েছিল বলেই দলের সবাই বললেন—চল গীতা ভ্যানে করে আমরা তো যাচ্ছিই, তোমাকেও হাওড়া পৌঁছে দিয়ে আসি। স্টেশনে যখন ভয়ে ভয়ে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ শুনি পিছন থেকে– 'দাঁড়ান', তাকিয়ে দেখি মৃণালবাবু। আমাকে বললেন– আজ এত রাতে আপনার লোক কি কেউ থাকবে– রাত সত্যিই অনেক হয়েছিল এবং কেউ ছিল না। তখন উনিই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম ওঁর মধ্যে একটা সহানুভূতি ছিল।

অন্য সময়েও দেখতাম উনি আমাকে বেশ প্রোটেকশান দিতেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমাদের মধ্যে প্রেমের কথা, প্রেমের চাওয়াচায়িটা ছিল না। একটা মেয়ে বড় অসহায়, তাকে খানিকটা সাহায্য করা। এরকমই ছিল ব্যাপারটা। পরে অবশ্য দুই পরিবারের লোকেরা মিলে আমাদের বিয়ে ঠিক করলেন।

বিয়ের আগে চিঠিতে নিয়মিত যোগাযোগ থাকত। ওঁদের অবস্থাও তখন খুবই খারাপ। কখনও কখনও আমাদের বাড়িতেও যেতেন এবং অর্ধেক দিনই হেঁটে যেতেন। 'দুধারা' ছবিটা শেষ পর্যন্ত রিলিজ করেনি। তার পরেই আমি নাটকে এলাম। বিজন ভট্টাচার্যের মরা চাঁদ', 'নীল দর্পণ', 'জ্বালা', 'বিসর্জন' এইসব এবং আরো কিছু নাটকের মধ্যে দিয়ে পরিচয় হলো বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, ঋত্বিক ঘটক, তাপস সেন, উৎপল দত্ত, মৃণাল সেনতো ছিলেনই। ওঁদের আড্ডা ছিল মৃণালবাবুদের বেকবাগানের বাড়িতে। উত্তরপাড়াতেও আমাদের নাটকের একটা গ্রুপ ছিল। সেখানেও মৃণালবাবু, তাপসবাবু গিয়ে ঐ দলটাকে নিয়ে নাটক করতেন। আমরা তখন গ্রামেগঞ্জে নাটক করে বেড়াতাম। তখন মৃণাল সেন পকেটে ছবি তৈরির বাজেট নিয়ে ছবি করার চেষ্টা চালাতেন। কিন্তু ছবি তৈরির উপায়টা আর হয়ে উঠত না।

এমনকি নিজের বাড়িতে আর আমার বাড়িতে কিছু আলাদা টাকা পাঠাবার জন্য কিছুদিন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ করতে শুরু করেন লক্ষ্ণৌ চলে গিয়ে। কিন্তু সেখান থেকে লেখা চিঠিতে ওঁর ছবি করার ইচ্ছেটা বুঝতে পারতাম। আমার বড় কষ্ট হত। শুধু এই ক'টা টাকা পাঠানোর চেষ্টায় এত যে ছবি করার ইচ্ছে, এটা একবার যদি অন্যদিকে ঘুরে যায়, হয়ত আর পারবেন না, কিংবা খুব কষ্ট পাবেন। চিঠিতেই বুঝতে পারতাম ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যে আছেন। আমিও চিঠিতে লিখতাম, আমার ভয় করে যদি আর ছবি না করতে পারো। তাই বলতাম ফিরে এস, এসে চেষ্টা কর, একেবারে বেরিয়ে যেওনা।

তারপর ফিরে আসেন। আর ১৯৫৩য় আমাদের বিয়ে হয়। তখনই একদম সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। ফলে পাঞ্জাবীটা তাপসের, ধুতিটা অমুকের, এমনভাবেই বিয়েটা হয়ে যায়। এরপরই ওঁর প্রথম ছবি 'রাতভোর'। আমরা তখন অশ্বিনী দত্ত রোডে একটা বাড়িতে থাকতাম। ছবির টাকা তখন পাওয়াও যায়নি আর ছবিটার কথা এখন বলতেও চান না। কারণ ওটা করে ওঁর নিজেরই মনে হয়েছিল 'সাংঘাতিক খারাপ, ছবি করতে আমি জানিনা'। ফলে

আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। এই সময়েই আমাদের ছেলের জন্ম হয়। ওকে তখন যে ফুড্‌টা দু'বারে খাওয়াবার কথা, বাধ্য হয়েই সেটা আটবারে ভাগ করে খাওয়াতাম।

সেই সময়েই একটা সময় আমি ওঁকে প্রচণ্ড দুরবস্থার মধ্যে দেখেছিলাম। না খেয়েও ইয়ার্কি করার একটা অভ্যাস ওঁর ছিল। কিন্তু একদিনের মত ভেঙে পড়তে আমি কোনদিন দেখিনি। সেদিন মাঝরাতে এমনকি বাচ্চাটাকে বাড়িওয়ালাদের কাছে রেখে দুজনে আত্মহত্যা করার কথাও উঠেছিল। আমি বলেছিলাম– কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমি বিয়ে করেছিলাম, তা একথা শোনার জন্যে নয়। যেভাবেই হোক্ বাঁচতে হবে, একথা যে চিরকাল বলে এসেছে হঠাৎ তার মুখে মৃত্যুর কথা আমি মানতে পারিনি। পরে অবশ্য সে সব কেটে যায়। তারপর আবার ছবি করার সুযোগ পান প্রায় আড়াই বছর পরে– নীল আকাশের নীচে। ছবিটা ভাল লাগে বহু মানুষের। কিন্তু মৃণাল সেন খুব একটা খুশী হননি। তৃতীয় ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' বছরখানেক বাদে। আমার মনে হয়, ''আমি ভাল ছবি করতে পারি'' এই বিশ্বাসটা ওঁর এলো। এই 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে। তবু কিন্তু অর্থাভাব মোটেই মিটল না। তাই বেঁচে থাকার লড়াই অনেক অনেকদিন থেকেই গেল।

একদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। চার পাঁচদিন ধরে আমরা কেউ ভাত খাইনি। টুকটাক খেয়ে চলছে। বাচ্ছা টাকে অবশ্য উপরে বাড়িওয়ালারা দু'বেলা দুটো খাইয়ে দিতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা নিজেই বললেন, 'গীতা, আজকে যেরকম করেই হোক একটু চাল যোগাড় করব।' বলে চলে গেলেন, তারপর রাত ন'টা আসেনই না। আমার হিটারে আমি জল একবার ফোটাচ্ছি আবার হিটার অফ্ করে রাখছি। এলেই চাল ধুয়ে ফেলে দেব। একটুও দেরি না হয়। হঠাৎ বেল বাজালেন। গেলাম।

কিচ্ছু পারলাম না গীতা। কাউকেই ধরতে পারলাম না।

আমি বললাম, ঠিক আছে। কিছুটা খই নিয়ে এসো। জলে ভিজিয়ে নরম করে খাওয়া যাবে।

মুড়ি চিবোনোর মত অবস্থাও তখন ছিল না। উনি চলে যাবার একটু পরেই ওঁদের বন্ধু নৃপেন গাঙ্গুলী এসে ওঁর খোঁজ করলেন। বেরিয়েছেন বলতেই তিনি অবাক–

আরে কি মুশকিল! একটা জমাটি আড্ডা হচ্ছিল দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে। বলল এই টুক করে একবার বাড়িটা ঘুরেই আসছি। আমি, কালীদা, ঋষিদা, ঋত্বিকদা এখনও অপেক্ষা করছি মোড়ের মাথায় ওঁর জন্যে।

ফিরে আসার পর সে কথা বলতেই অমনি বললেন 'সর্বনাশ'। এটাই ওঁর চরিত্র। ভেঙে পড়ার লোক নয়। এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে দিয়েই চলতে চলতে 'ভুবন সোম' করার পর আমাদের জীবনের প্রচণ্ড অসুবিধেগুলো একটু একটু কমতে থাকল। আমরা একটা বাড়িও পেলাম। মতিলাল নেহেরু রোডের একটা বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করলাম।

ওঁর ছবিতে আমার প্রথম অভিনয় 'কলকাতা ৭১'- এ। চাল বিক্রি করে যে ছেলেটি, স্মাগলার তার মায়ের রোলটা করেছিলাম। সেটা করার পর আবার করলাম 'একদিন প্রতিদিন'। সত্যি কথা বলতে কি আমাকে 'একদিন প্রতিদিন'-এ একেবারে চিন্তা করেননি। আমি যে করব এটা নিয়ে বাড়িতে কোন আলোচনাও হয়নি। অন্য কাউকে কাউকে চেষ্টা করেছিলেন। যেমন নাটকের একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রীকে ফোন করেছিলেন। এক মা ও তার মেয়েকে নিয়ে গল্পটা শুনে জানতে চান মা ও মেয়ের মধ্যে কোন্ রোলটা বড় বা কোনটা ইম্পর্ট্যান্ট চরিত্র। তখন উনি বলেছিলেন, না আমি এরকম করে কখনও বলতে পারিনা। ছবি করতে গিয়ে কি দাঁড়াবে তা আমি এখনও বলতে

পারিনা। আমার মনে হয় আপনার না করাই ভাল। খোঁজাখুঁজি করে কাউকে না পেয়ে শেষপর্যন্ত আমাকে নিলেন। পরে অবশ্য সেই অভিনেত্রী ফোন করে আমাকে বলেছিলেন, সেদিন যদি মৃণালবাবুর কথায় রাজি হয়ে যেতাম তবে আপনার মত একজনের অভিনয় আমি দেখতে পেতাম না। তাঁর কাছ থেকে এরকম একটা প্রশংসা পাওয়া আমার কাছে একটা মস্ত বড় কথা।

'৭২ সালে 'কলকাতা ৭১' ছবিতে অভিনয় করার আগে অবশ্য আমি আবার নাটকে অভিনয় করতে আরম্ভ করেছিলাম '৬৪ সাল নাগাদ। আমার ছেলের বয়স তখন ১০ বছর, আমি উৎপল দত্ত-র 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে' 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' নাটকে অভিনয় করি। তারপর আরও ৬ বছর বিভিন্ন নাটকে যেমন, 'ওথেলো', 'কল্লোল', 'তীর' ইত্যাদিতে অভিনয় করি।

মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে একথা আমার মনে হয়েছে বয়স যখন অল্প ছিল টেনশন তখনও ছিল। কিন্তু মানুষ যখন বুঝতে পারে তার দায়িত্ব বাড়ছে, একটু সুনাম হয়েছে, তার কাছে মানুষ ভাল কিছু চায়- তখন তার ওপরেও প্রত্যাশার চাপ বাড়ে। তখন থেকেই আমি দেখতাম কাজ করার সময় ওঁর চরিত্র ভীষণ বদলে যেত। এমনকি স্ক্রিপ্ট লেখার সময় থেকেই ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যায়। আগে আগে কখনও দীঘায় বা এম. এল. এ. হোস্টেল বা হোটেলরাজ-এ একটা ঘর নিয়ে তিন থেকে চারদিনের মধ্যে স্ক্রিপ্ট করে ফেলতেন। ইদানিং অবশ্য স্ক্রিপ্টটা এখানেই করেন। দেখেছি ওঁর মাথায় সবটা থাকে। পুরো স্ক্রিপ্ট কখনো করতেন না। একটা আন্দাজমত কিছু ওঁর করা থাকত। তারপর শ্যুটিং করতে করতে বাড়ত। কখনও দেখা যাবে শ্যুটিং-এর সময় বাড়তি পাতা যোগ হচ্ছে। এভাবেই বাড়তে থাকে। শ্যুটিং সেরে বাড়ি ফিরেও আবার রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত ওকে লেখাপড়া করতে দেখেছি। আর এইসব অদল বদল চলতে থাকার সময়ে বা কোন স্ক্রিপ্ট এমনকি চিঠি লিখে হলেও সবসময় আমায় বা আমার ছেলেকে কিংবা অন্য কাউকে পড়ে শোনাবেনই।

'ভুবন সোমের' সময় মোটামুটি একটা স্ক্রিপ্ট পড়ে শোনানোর পর আমি প্রথমে বলেছিলাম ওটা ছবি হয়না, ওরকম একটা ছবি করলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু ছবি করতে করতে প্রচণ্ড অদল বদল করেছিলেন। আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, গীতা আমি প্রচুর পাল্টাচ্ছি কিন্তু এত সময় নেই যে সব ডিটেলস্ লিখব। আমার মনে হয় এখন আর তুমি বলবে না যে এ ছবি করলে বাড়ি থেকে চলে যাবে।

তাছাড়া কাকে কোন চরিত্রে নেওয়া যাবে এসব নিয়েও সবসময় আলোচনা করতে উনি ভালবাসেন। বিশেষত মেয়েলি ব্যাপারটা উনি কোনদিনই তেমন জানতেন না। মা, বৌদি, বোন সবার মধ্যে থাকলেও পড়াশোনা, বেরনো, আড্ডা, বন্ধু এসব নিয়ে সংসারের ভিতরটায় উনি তেমন ঢোকেননি। কাজেই যখনই কোন ঘরোয়া আবহ তৈরির কথা থাকে তখনই আলোচনা করেন, যেমন 'খারিজ'। ওতে ওঁর একটা চিন্তা ছিল বন্ধ ঘরের মধ্যে উনুন জ্বালা অবস্থায় রাত্রিবাস করে ছেলেটি যে মারা যাবে এটা হবে কি করে? আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কাজ শেষ হবার পরও ঘরে উনুন জ্বালিয়ে রাখা, এটা কি তোমরা কর? আমি বললাম কখনো করিনা। উনুনের আগুন খুঁচিয়ে নিচে ফেলে ঢিমে আঁচে একটা কড়াই বা কিছুতে করে খানিকটা জল গরম বসিয়ে রাখি। যাতে ফুটে গেলেও তাপটা জল নিয়ে নেয় অন্য কোথাও আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে না। পরে আবার একদিন জিজ্ঞেস করলেন কি করে আগুনটা রাখা যায় বল তো। তখন আমি বললাম অনেক সময় আমরা শেষ উনুনে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি করে সাবান ফোটানোর জন্যে জামা কাপড় ভিজিয়ে রেখে দিই। কুচো কয়লা দিয়ে আধ ঘন্টার মেয়াদী আগুন তৈরি করে তাতে সাবান কাচার

এই ব্যবস্থাটা 'খারিজ'-এ কাজে লাগিয়েছিলাম। মমতাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল উনুনে কি ছিল ডেকচি বসান দেখলাম। তখন মমতা বলে যে একটু জামাকাপড় ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

অভিনেত্রী হিসেবে শাবানাও খুব সাহায্য করে। ময়লা শাড়ি পরা, পুকুরধারে থাকা গ্রাম্য মেয়ের পেটিকোট যে ধপ্‌ধপে ফরসা হয় না এটা সবসময়েই ওর খেয়াল থাকে। 'খণ্ডহর' করার সময় বোলপুরের লোকেশানে স্থানীয় মেয়েদের দেখেই আটপৌরে কাপড় পরা রপ্ত করে এসে ও আমায় দেখিয়েছে। পরে দেখেছি ঐরকম শাড়ি পরার বাঙালি ভঙ্গিটা আয়ত্ত করে ও কি দারুণ কাজে লাগিয়েছে ছবির মধ্যে। বাড়িতে থাকার সময় কাপড়ে একটু ঢিলেঢালা ভাব থাকে। কিন্তু দাদা আর তার বন্ধু এসে যেই নীচ থেকে নাম ধরে ডেকেছে অমনি সে আঁচল এবং কোমরের কাপড় পরিপাটি করে নিতে নিতে দরজার দিকে এগোয়। আমিও মা'র চরিত্রে অভিনয় করার সময় এরকম সাধারণ ব্যাপারগুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করেছি। আমি দেখি অনেক ছবিতেই মা রান্নাঘরের মা হলেও তার এতখানি চুড়ি পরা হবে। একটা বড় সিঁদুরের টিপ দেওয়া হবে, তার কাপড়টা মাড় দেওয়া হবে। সব মিশিয়ে একটু হলুদলাগা আটপৌরে মা'কে আমরা পাই না। পা ঢেকে শাড়ি পরে ঐ মায়ের চরিত্রটা হয়ে ওঠা যায়না বলে আমার মনে হয়েছে। আমি আমার জা, আমার দিদি, কাজের লোক মঙ্গলা এঁদের কাছ থেকে শাড়ি সংগ্রহ করেছি, চায়ের - লিকারে ডুবিয়ে ব্লাউজের একটা চেহারা এনেছি আবার কথাবার্তা চলাফেরার অ্যাটিচুডেও আমার দেখা - মায়েদের মত হতে চেয়েছি। আমার শাশুড়ি, মা, কাকিমাদের যেমন দেখেছি আমার ইচ্ছে ছিল ঠিক তেমনটাই হয়ে উঠব। যে মায়ের অতবড় ছেলে বা বা অতবড় মেয়ে তার চেহারার আদলটা ধরার জন্য অভিনয়ের সময় আমি অন্তর্বাস ব্যবহার করিনি, পিঠের কাপড় পুরো ফেলে রেখেছি। এক কথায় আমি অনেক জেনুইন হতে চেয়েছি। মৃণালবাবুও এটা মেনে নিয়েছেন, সমর্থন দিয়েছেন। বলেছেন, দেখো আমি দেখি মা অনেক সময়েই যুবতী মা। কেন তা হবে? অন্যান্য ব্যাপারে যথেষ্ট খেয়াল রাখলেও মেয়েলি ব্যাপারগুলো একটু ওঁর চোখ এড়িয়ে যায় বলেই সম্ভবত আমার ওপর এক্ষেত্রে নির্ভর করেন।

জনৈক প্রযোজক একবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেবল রাজেশ খান্নাকে নিয়ে একটা ছবি করলে ওঁকে ৫ লাখ টাকা দেবেন। এমনকি তাঁর কথা শুনে একদিন রাজেশ খান্না নিজেই ফোন করে ফেললেন। কিন্তু ছবিটা উনি করেননি। করতে চাননি বলেই। আর তার পরেই নিজের - মনে মনে কেমন কুণ্ঠাবোধ করেছেন। একদিন দুপুরে খাবার সময় আমাকে আর আমার ছেলেকে প্রায় জবাবদিহির ভঙ্গীতে বললেন, ''ছবিটা করলাম না, - তোমরা হয়ত ভাবছ অনেকগুলো টাকা পাওয়া যেত।'' শুনে আমরা তো অবাক। আসলে প্রচুর পরিমাণ স্বচ্ছলতা আমাদের দিতে পারেন নি বলে একটা আক্ষেপ ওঁর মধ্যে তৈরি হচ্ছিল। আমার ছেলে অবশ্য বলল, ''বরং ওরকম একটা ছবি করলেই আমাকে অন্য কারোর বাড়ি গিয়ে উঠতে হত।''

এইটাই মৃণাল সেন, ওঁর মনোজগতের এই চেহারাটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই এতদিন ওঁর সঙ্গে চলতে কোন অসুবিধা হয়নি।

উৎস : 'ফিরে দেখা মৃণাল সেন'-
ছায়াচিত্র বিশেষ সংখ্যা, ২০০০

মৃণাল সেন
নিজের কথায়, স্মৃতিতে, সত্তায়

শিবাদিত্য দাশগুপ্ত

লেখার বিষয় যখন মৃণাল সেন, তখন তাঁরই কথা দিয়ে লেখাটা শুরু করা যাক:

...আমি আমার ক্ষেত্রে দেখেছি, একটা লিখলাম, করলাম হয়তো আর একটা, সব মেটিরিয়ালস নিয়ে যখন এডিটিং রুমে বসা হল, তখন হল আরেকটা। এই পরিবর্তন কিন্তু অনিশ্চয়তা থেকে আসে না, এটা হচ্ছে একটা কনসট্যান্ট সেন্স অফ গ্রোথ থেকে। লেখালিখির ক্ষেত্রেও তাই।

যে কথাগুলো বিভিন্ন সময়ে আগে বলেছিলাম বা লিখেছিলাম, সবটাই আবার নতুন করে বলা যায়, লেখা যায়। লেখা যায় এবং বলা যায় আরো গুছিয়ে, নতুন মাত্রা যোগানো যায়–যায় কেননা অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, যুক্তি সবকিছুই গড়নে ভাবনায় সর্বদাই বাড়ন্ত, বেড়েই চলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এবং সতর্কতাও বাড়ে। হেমিংওয়ের একটা উক্তিতে আমার খুব সায় আছে–উনি বলেছিলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব কি বুদ্ধি বেড়েছে? মনে হয়, না। তবে আগের তুলনায় আরো অনেক সতর্ক হয়ে উঠেছি, এটা ঠিক। সত্যি, শিল্পের সমস্ত প্রক্রিয়াটা, অভিজ্ঞতাটা, শিল্পীকে কিছুটা রূপান্তরিতও করে, সে ওয়াইজার হয়।

('ভূমিকা', আমি ও আমার সিনেমা, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০১৫)

পঁচানব্বই (৯৫) বছর বয়সে, মৃত্যুর ঠিক তিনবছর আগে–জীবন-সায়াহ্নে এসে মৃণাল কথাগুলি লিখেছেন। এই কথা যে তিনি এই প্রথম বলছেন তা নয়, সারাজীবন ধরে বিভিন্ন লেখায়, সাক্ষাৎকারে নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে বলেছেন। এমনকি মৃণাল সেনের নির্মিত চলচ্চিত্রে ধারাবাহিকভাবে বিষয়ে, আঙ্গিকে, চরিত্রনির্মাণে এই গতিময়তা লক্ষণীয়। তাঁর ভাবনা কখনও কোনো বন্দিদশায় আটকে পড়েনি। মুক্তমনে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাবনাকে নিজের দেখাকে সমসাময়িকতার সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন। ধ্রুব গুপ্তকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন:

যে যাই বলুন বা মনে করুন, সময়কে সমঝে নিয়ে চলার তাগিদ অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে। শিল্প- সাহিত্যের ইতিহাসটা উল্টে-পাল্টে দেখুন। দেখুন সময়ের সঙ্গে শিল্পকর্মীর আত্মীয়তা কত গভীর। সময়ের দাসত্ব নয়, সমঝোতা–এই ব্যাপারটাকেই কী পণ্ডিতেরা ডায়ালেকটিকস্ বলেন না?

(প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র, সিনে গিল্ড, বালি, হাওড়া, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর, ১৯৮৭)

আবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 'নিজের ছবি আয়নায়' লেখায় বলেছেন:

পুরোনো ঘটনাগুলো চড়া গলায় জাহির করতে চাই না, চাই নিজেকে যাচাই করতে, নিজেকে প্রশ্ন করতে, অনেক কিছুই হিসেব নিকেশ করতে, পুরোনো যে কোনো সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাই আত্মসমালোচনার তাগিদে, হয়তো বা কোথাও কোনো অবিশ্বাসজনিত অস্বস্তির দরুণ। হয়তো বা আরো অনেক কিছু করবার প্রয়াসে, ভাঙার মেজাজে, তর্কের মেজাজে।

(সিনেমা, আধুনিকতা, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২)

এখানেই শুধু বিশেষণে নয়, আমাদের বোধের গভীরে সমস্ত স্থবিরতাকে ভেঙে মৃণাল সেন হয়ে ওঠেন প্রকৃত অর্থেই 'পদাতিক', বিরামহীন হেঁটে চলেছেন– খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালে হৃদস্পন্দনে তাঁর পদধ্বনি অনুভূত হয়।

'মুহূর্তের সার্থকতা'-র টানে ভেসে চলা 'শিল্পীদল'-এর বিপরীত স্রোতে মৃণাল সেনের ছবি, সাক্ষাৎকার, লেখনী আমাদের আত্মানুসন্ধানের অনুশীলনের পাঠক্রম হয়ে উঠতে পারে। 'পারে' শব্দটির মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততা আছে, কারণ বিশ্বায়িত পৃথিবী আমাদের যে-জীবনচর্যায় অভ্যস্ত করে তুলেছে, তাতে আমরা কতটুকু এই 'আত্মানুসন্ধান'-এর উপলব্ধিতে পৌঁছোতে পারব? জন্মশতবর্ষ পেরিয়ে গেলে মৃণাল সেন আবার বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন না তো?

২০১২ সাল। সবে মৃণাল সেন নব্বই বছর পেরিয়েছেন। ওনার বেশ কিছু নিকটজনের শোকলিপি, সম্মাননা গ্রন্থের লেখা এবং তিনটি গদ্য নিয়ে একটি বইয়ের পরিকল্পনা করা হয়। লেখাগুলি ১৯৫০ থেকে ২০১২ সময়সীমায় প্রকাশিত। লেখাগুলি প্রকাশের অনুমতির জন্য আমার প্রথম মৃণাল সেনের মুখোমুখি হওয়া। প্রারম্ভিক কথার পর লেখাগুলির প্রতিলিপির ফাইল ওনার দিকে এগিয়ে দিই। একটা একটা করে প্রতিটি লেখা একনাগাড়ে দেখে ফাইলটি বাঁধতে বাঁধতে জানালেন বেশ কিছু লেখার কথা উনি ভুলেই গিয়েছিলেন, তারপর জানালেন লেখাগুলি আর-একবার পড়তে চান। লেখার মেজাজ ও বক্তব্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রয়োজনে কোনো লেখার একটু সংযোজন করতে পারেন। কথায় কথায় কিছুটা সহজ হয়ে যাওয়ার পর উৎপল দত্ত সম্পর্কিত স্মৃতিমূলক লেখাটা নিয়ে আমার দ্বিধার কথা জানাতেই বললেন আবার নতুন করে লেখাটি লিখে দেবেন, সাতদিন সময় নিলেন।

ঠিক সাতদিনের মাথায় সকালে ফোন–লেখাটি নিয়ে আসার জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে গেলাম, ওনার পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে লেখাটা হাতে দিয়ে বললেন পড়ে দেখার জন্য। আমি পড়ছি, ঠিক উলটোদিকে তিনি বসে। লেখাটি পড়ে একটু দোনোমনো করেই বললাম, ''ঠিক আছে''। শুনে তিনি একটু ধমকের সুরেই বললেন, তোমার মুখ

বলছে ঠিক নেই। আমার হাত থেকে লেখাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি স্তম্ভিত! কিন্তু তিনি নতুন করে লেখার জন্য আবার সাতদিন সময় নিলেন। আমার সঙ্গেই ছিল মৃণাল সেনের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, লেখালিখি ও উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর দৈনিকপত্রে তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার প্রতিলিপির ফাইল–হাতে তুলে দিতেই খুশি হয়ে বললেন, ''আমার কাজটা সহজ করে দিলে।'' আবার সাতদিনের মাথায় ফোন লেখা নিয়ে আসার জন্য। গেলাম, বসালেন পড়ার ঘরে, হাতে লেখা নিয়ে বললেন, ''জমেনি লেখাটা। একটা কাজ করো, আমি বলে যাচ্ছি তুমি লিখে নাও। আর তোমার যখন যা মনে হবে, আমাকে থামিয়ে বলবে।'' অবশেষে এই পদ্ধতিতে ঘন্টা দু-একের পরিসরে লেখাটা তৈরি হল। নির্মাণ হল অনেক মুখ অনেক মুহূর্ত গ্রন্থ (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, থীমা, কলকাতা, ২০১৭)।

একানব্বই বছর বয়সে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালকের একটি ছোটো লেখার জন্য সতেজ একাগ্রতা দেখে আমার মাথা নীচু হয়ে গেল। মনে রাখা দরকার, এর আগেই মৃণাল সেনের ইংরেজি ও বাংলায় যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ হয়ে গেছে।

মহিলা কবি ইঙ্গবর্গ বাখমান (Ingeborg Bachmann, ১৯২৬-৭৩) লিখেছিলেন: ''যুদ্ধ এখন আর ঘোষিত হয় না / বরং চলতেই থাকে, কেলেঙ্কারি / প্রাত্যহিক হয়ে উঠেছে।'' (অনুবাদ: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

কবিকে অনুসরণ করে বর্তমান ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বলাই যেতে পারে সন্ত্রাস এখন আর বিক্ষিপ্তভাবে হয় না। সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংক্রামিত হয়ে গেছে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে, মানুষে মানুষে সন্ত্রাস চলতেই থাকে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তো ক্রমবর্ধমান ঘোর আতঙ্কে, অনিশ্চয়তায় মানুষ দিনাতিপাত করছে। এমন অবস্থায় মিডিয়ার ছাপমারা তথাকথিত চিন্তাশীল পরিচালকদের নিজের ছবি নিয়ে পাতাজোড়া সাক্ষাৎকারে কোথাও কোনো বিরুদ্ধ স্বর কি শোনা যাচ্ছে? (এখানে বিকল্প ধারার তথ্যচিত্র বা ছোটো ছবির কথা বলছি না) বরং তারা অদ্ভুত এক অথরিটেরিয়ন ভঙ্গিতে অনেক কথা বলে যান, যা একরকম স্বৈরস্বরেরই সমর্থক, ক্ষমতাতন্ত্রেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে। তাদের ঐ বাকসর্বস্বতার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দ্বন্দ্ব নেই, আত্মবিশ্লেষণ নেই, আত্মানুসন্ধান নেই - সবজান্তার মতো বোধহীন আত্মাভিমানের বাগাড়ম্বর থাকে শুধু।

বিপরীতে আমরা দেখি মৃণাল সেন তাঁর প্রথম ছবি 'রাতভোর' (১৯৫৫) সম্পর্কে অকপটে বলেন: ''আমি বুঝলাম আমি ঠিক মতো ছবি করতে শিখিনি।'' এই আত্মোপলব্ধিই তাঁকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। এর পাশাপাশি আমরা মৃণাল সেনের বিভিন্ন লেখায়, কথায় লক্ষ করি যে, চলচ্চিত্র-পূর্ব জীবন সম্পর্কে দুটো কথা বারংবার বলছেন–প্রথমত, চল্লিশের দশকে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া এবং দ্বিতীয়ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি-তে (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি) মনযোগী পাঠ-পর্বের কথা। আর-একটি বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, চলচ্চিত্র নির্মাণে জড়িয়ে পড়ার আগেই চলচ্চিত্র নিয়ে তাত্ত্বিক লেখালিখিও শুরু করেন তিনি। বামপন্থার সঙ্গে যোগ, বিস্তৃত পাঠাভ্যাস ও তাত্ত্বিক লেখালিখির অনুশীলনই তার মন, মানসিকতাকে সমগ্র জীবন সজীব ও সতেজ রেখেছে। কখনও নির্দ্বিধায় বলেছেন, ''আমি কনফিউজড'', আবার নিজের পথ খুঁজে নিয়েছেন, বারবার নিজেকে ভেঙেছেন সমাজ সম্পৃক্ত থেকে চলচ্চিত্রের বিষয়, ভাষা ও আঙ্গিকের খোঁজে।

ত্রিশ-চল্লিশের দশকের বামপন্থী আদর্শের সূত্র ধরে বাঙালি সমাজজীবনে যে উজ্জীবন ঘটেছিল, তার উত্তরাধিকার মৃণাল সেন তাঁর কাজে, মানসিকতায় বয়ে নিয়ে গেছেন। আজ তাঁর জন্মশতবর্ষে উদযাপনের উচ্ছ্বাসকে পেরিয়ে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে আসা অন্ধকার সময়ে আমাদেরই দায় চিন্তনে, জীবনচর্যায় সেই উত্তরাধিকারের আলোকরশ্মির বিস্তারের।

আত্মাভিমান নয়, আত্মোপলব্ধিই আমাদেরকে এই বন্ধুর পিচ্ছিল পথের পদাতিক করে তুলতে পারে।

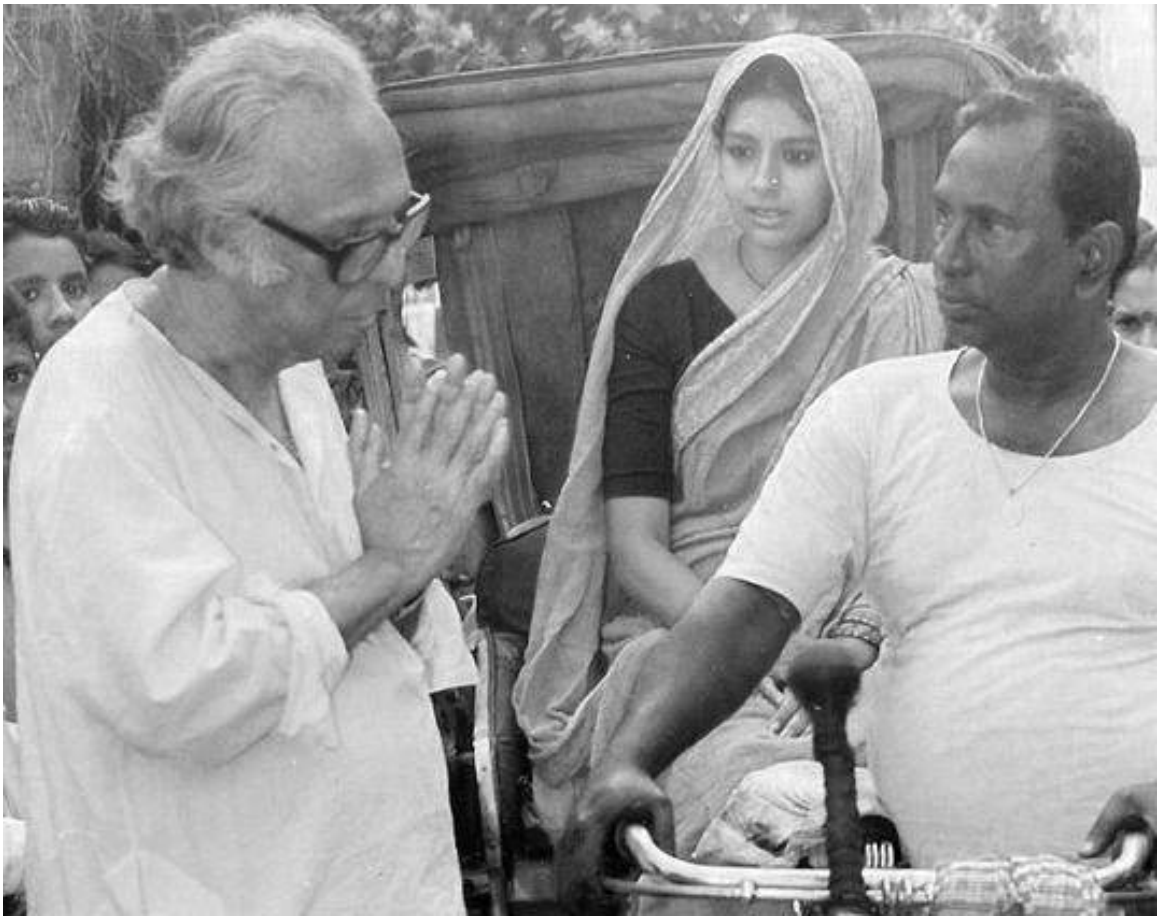

মৃণাল সেন এবং তাঁর চলচ্চিত্র উত্তরাধিকার
সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের যুদ্ধে কেন আমাদের খড়কুটো?

সংহিতা সেন

বম্বের চলচ্চিত্রকার অনুরাগ কাশ্যপের একটা সাম্প্রতিক আলটপকা মন্তব্যে বাংলার চলচ্চিত্রদুনিয়ায় প্রবল তোলপাড় হয়েছিল, যদিও যে ডিজিটাল ডিস্টোপিয়ায় আমরা এখন বাস করি, সেই কাল এবং অবস্থার নিয়ম অনুযায়ী এই চাঞ্চল্য ও বিরক্তিও ছিল ক্ষণস্থায়ী। দুদিন পরেই সমাজমাধ্যমের চন্ডীমন্ডপে আরেক সন্দর্ভের আবির্ভাবে প্রত্যাশিতভাবে এই চাঞ্চল্যের পশ্চাদাপসারণ ঘটে। কিন্তু বাংলায় চলচ্চিত্রনির্মাণ নিয়ে কাশ্যপের মন্তব্যে কোনও সত্য ছিল না এমন বলা যায় না। হাতে গোনা যায় এমন কতিপয় স্বাধীন চলচ্চিত্রনির্মাতা ছাড়া বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে যে ধরনের ছবি তৈরি হয় তা সমসাময়িক বাস্তবের থেকে বহুযোজন দূরে অবস্থিত নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক অবস্থার অবিচ্ছিন্ন অংশ এক অদ্ভুত ভোগবাদী সাংস্কৃতিক পণ্য যার আয়ু মাত্র কয়েক সপ্তাহের মাল্টিপ্লেক্সে

বিনোদন সমারোহেই শেষ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ, দু:খ, সমস্যা বা সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক বা ঐতিহাসিক কোনও প্রতিফলন এইসব ছবিতে অনুপস্থিত। কয়েক দশক বাদে যদি কোনও গবেষক এই সময়ে তৈরি বাংলা ছবি অধ্যয়ন করে, সমসাময়িক বাংলা বা ভারতকে কোথাও খুঁজে পাবে না। ফাস্ট ফ্যাশনের মতো ফাস্ট কালচারাল কমোডিটি বর্তমানের বাংলা ছবি। ভারতে তৈরি প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে কোটি কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগে তৈরি ক্ষণস্থায়ী ডিজিটাল কন্টেন্টমাত্র যা জনপরিসরে কোনও বিতর্ক বা আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি করে না, চলচ্চিত্র মাধ্যম নিয়ে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করে না, কোনও বৌদ্ধিক বিনিয়োগ বা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধার ধারে না। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সাধারণ দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের যে ধারা বামগণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন তৈরি করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে ও পরের কয়েক দশকের একনিষ্ঠ কাজের মাধ্যমে, নয়ের দশকের পর ভারতের নবউদারবাদী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাকে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে পাল্টাতে থাকে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী তার্কিক চিন্তাশীল দর্শকের বদলে জনমানুষকে নিষ্ক্রিয় উপভোক্তা এবং যূথবদ্ধ অবৌদ্ধিক ভক্তদলে পর্যবসিত করতে উদ্যোগী হয়। এই ভক্তদল প্রশ্ন করতে পারে না, প্রতিস্পর্ধা ছুঁড়ে দিতে পারে না, বর্জন করতে পারে না, কোনও বিকল্প কল্পনা করতে পারে না। নিজের মতো করে ভাবতে ভুলে যাওয়া এমন ভক্তদলই আমাদের দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের উত্থান, শক্তিবৃদ্ধি ও সাম্প্রতিক প্রতিপত্তির পেছনে একটা বড় শক্তি। এমনতর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ভারতের বহুসাংস্কৃতিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সামাজিক ন্যায় এবং সংবিধাননির্ভর গণতন্ত্রে আস্থাশীল যে কোনও ভারতবাসীর কাছে মৃণাল সেন এবং তাঁর মতো অন্যান্য সমাজসচেতন শিল্পকর্মীদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার মৌলবাদী হিন্দুত্ব এবং ফ্যাসিবাদের যুদ্ধে আমাদের খড়কুটো।

প্রশ্ন হচ্ছে শিল্প ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জনমানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ কেন জরুরি? সক্রিয় সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ দর্শক তথা বৃহত্তর সমাজের মানুষজনের সাথে শিল্পীর সমকক্ষতা তৈরি করে বৌদ্ধিক মতবিনিময়, বিতর্কপ্রতর্ক, ও আলোচনার একটা গণতান্ত্রিক পরিসরের সম্ভাবনা খুলে দেয়। শিল্পকে কেবল শিল্পীদের প্রাংশু একক সৃষ্টি হিসাবে না দেখে, দলমত, শ্রেণি এবং আত্মপরিচয় নির্বিশেষে দর্শক তথা বৃহত্তর সমাজের মানুষের সামূহিক অংশগ্রহণের এক উপায় হিসাবে উন্নীত করাই প্রগতিশীল শিল্পচর্চার লক্ষ্য। ভারতের মতো প্রবল শ্রেণিবিভাজিত, কাঠামোগত বঞ্চনাপীড়িত সমাজে বামগণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন শিল্পচর্চাকে বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণির একাধিপত্যের আগল ছাড়িয়ে জনগণের হাতের নাগালে আনার চেষ্টা করেছিল সাধারণ মানুষের জীবনকে শিল্পের সীমানায় নিয়ে আসার মাধ্যমে। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের দুই দিকপাল মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটক এই শিল্প আদর্শ থেকে উঠে আসা দুই সমসাময়িক চলচ্চিত্রকার। এঁদের ছবিতে আমরা সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলনই শুধুমাত্র দেখি না। তাঁদের ছবি আমাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, প্রবহমান কাঠামোগত বঞ্চনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। পক্ষ নিতে প্ররোচিত করে, উৎসাহিত করে। মনে রাখা দরকার, এই শিল্পচর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আত্মসমীক্ষা, আত্মঅবগতি, ইতিহাসবোধ, সমাজরাজনৈতিক চেতনা, আদর্শগত সততা, পরদুঃখকাতরতা, মানুষের মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতি আনুগত্যবোধ এবং সর্বোপরি শিল্পীর সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা। শিল্পচর্চায় এই দিকগুলোর উপস্থিতিই তাঁদের ছবিতে বলা সাধারণ মানুষের জীবনের গল্পের বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার কারণ। অন্যদিকে এই দিকগুলোর অনুপস্থিতি সাম্প্রতিক প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা ছবির বাস্তবপরান্মুখতার অন্যতম কারণ বলে মনে করি। উল্লেখ করা দরকার যে উপরিউক্ত বিষয়গুলির একটি আরেকটির থেকে বিচ্ছিন্ন কতগুলো বিষয় নয়, একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকা এই বিষয়গুলো বাম প্রগতিশীল

রাজনৈতিক আদর্শগত ধারণার অন্যতম ভিত্তি। রাজনৈতিক আদর্শে দৃঢ়ভাবে সিঞ্চিত জমিতে সৃষ্ট মৃণাল সেনের ছবিতে সাধারণ অবিশিষ্ট মানুষের জীবন এবং উপমহাদেশের ইতিহাস তাই নিছক শিল্পের বিষয়বস্তু না হয়ে, হয়ে ওঠে সমাজের দর্পণ।

দীর্ঘ পাঁচ দশকের সক্রিয় শিল্পচর্চার জীবনে মৃণাল সেন বানিয়েছেন সাতাশটি কাহিনীচিত্র, চোদ্দটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, এবং পাঁচটি তথ্যচিত্র। কাঠামোগত বঞ্চনা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষয় এবং তদজনিত মানবিক প্রতিক্রিয়া তাঁর ছবির উপজীব্য। ৪৩ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে তৈরি ১৯৬০এ তৈরি 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিটি থেকে সুরু করে ২০০৩ এ তৈরি 'আমার ভুবন' অবধি তৈরি সব ছবিতেই কোনও না কোনওভাবে এই বিষয়গুলি ঘুরে ফিরে এসেছে। সেনের নানান সাক্ষাৎকারে আমরা জানতে পারি কীভাবে তিনি প্রথমে ''বাইরের শত্রু'' (external enemy) এবং পরে ''ঘরের শত্রুর'' (internal enemy) বিরুদ্ধে তাঁর ছবির আখ্যানে সমালোচনা শানিয়েছেন ক্রমাগত। বাইরের শত্রু বলতে তিনি মূলতঃ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ঔপনিবেশিকতা প্রভাবিত দেশীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কথা বলেছেন। ঘরের শত্রু স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে দেশের সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী এবং সামাজিক/রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ক্ষমতাকাঠামো। সামাজিকভাবে বঞ্চিত সাধারণ মানুষদের অখ্যাত সাদামাটা জীবনকে তিনি ক্রমাগত তাঁর ছবিতে চিত্রণ করে গেলেও তা করেছেন তাঁর শ্রেণি, লিঙ্গপরিচয় ও বর্ণগত পরিসরের মধ্যে থেকেই। সাধারণ জীবন এবং সাধারণত্বের প্রতি তাঁর দায়বোধ বোঝা যাবে একটি উদাহরণে। ২০১৫তে শিল্পী ও চিত্রপরিচালক নন্দিতা দাসের সাক্ষাৎকার নেবার সময় তিনি মৃণাল সেনের সাথে তাঁর কোনও এক সময়ে হওয়া একটা কথোপকথনের কথা আমাদের বলেন। আফসার আহমেদের লেখা ধানজ্যোৎস্না উপন্যাসকে চিত্ররূপ দেন মৃণাল সেন তাঁর শেষ কাহিনীচিত্র 'আমার ভুবন' ছবিতে। সেই ছবিতে দরিদ্র কৃষকবৌ সাকিনার ভূমিকায় অভিনয় করেন নন্দিতা দাস। তাঁকেই কেন নিলেন এই ভূমিকায় এই প্রশ্নের উত্তরে মৃণাল সেন নন্দিতাকে বলেন - "because you look extraoridinarily ordinary– like Smita (Patil)." এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ৪৩ এর মন্বন্তরের উপরে তৈরী অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পাশ্রিত মৃণাল সেন পরিচালিত 'আকালের সন্ধানে' ছবিতে স্মিতা পাটিল এক অভিনেত্রীর প্রধান ভূমিকায় কাজ করেছিলেন। শহর থেকে ১৯৪৩ এর মন্বন্তরের উপরে একটি ছবি করতে একটি দল আটের দশকে গ্রামে যায়। এই শুটিং ঘিরে নানান ঘটনায় ছবির আখ্যান আবর্তিত হয়। সেই আকালের ছবিতে অভিনেত্রী স্মিতা এক কৃষকবৌয়ের ভুমিকায় অভিনয় করেন। 'আকালের সন্ধানে' ছবিটি তুলে ধরে কীভাবে মন্বন্তর ও স্বাধীনতার চার দশক কেটে গেলেও বঞ্চিত মানুষের অবস্থা একই থেকে গেছে উপমহাদেশে। শুটিং টিমকে গ্রামে ঢুকতে দেখে এই ছবির এক চরিত্র বলে ওঠে - 'শহর থেকে বাবুরা আকালের ছবি তুলতে এয়েচেন, আকাল তো আমাদের সর্বাঙ্গে।' ২০০৩ এও এই দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং অভাবের ছবি একইরকম মনোযোগে তিনি তুলে ধরেছেন 'আমার ভুবন ছবিতে'। এমনই ছিল অখ্যাত অবিশিষ্ট সহনাগরিকদের প্রতি মৃণাল সেনের সহমর্মিতা, শিল্পের রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে ব্যবহার করার দক্ষতা এবং শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের প্রতি দায়বোধ। আজকের ধর্মীয় উন্মাদনা ও হিন্দু মৌলবাদ আক্রান্ত দেশে দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক চর্চাকে আমাদের হিন্দুত্ব ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধের আয়ুধ করে তুলতে হবে। সে প্রেক্ষিতে মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটকের মত শিল্পীদের শিল্প ও সাংস্কৃতিকচর্চা আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের একমাত্র পাথেয়। আজ যখন আমরা মৃণাল সেনের শতবর্ষ উদযাপনে প্রয়াসী হয়েছি, কেবল এই বছরেই রাজনৈতিক শিল্পচর্চা এবং বিশেষতঃ মৃণাল সেনের ছবির চর্চাকে সীমাবদ্ধ না রেখে, সক্রিয়ভাবে আমাদের সকলের আরও বেশি করে সম্মিলিতভাবে এমন ছবি দেখা এবং আজকের সময়ের নিরিখে ছবির বিষয়বস্তু ও সন্দর্ভের নিবিড় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

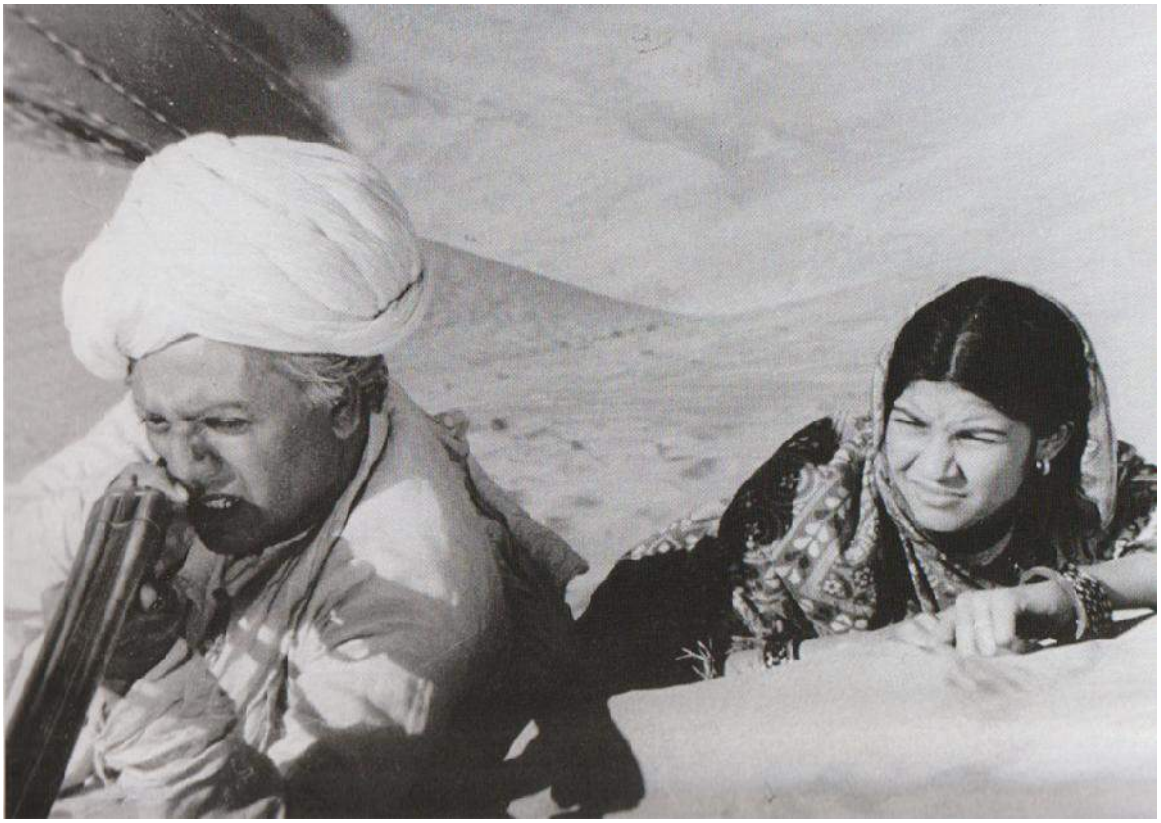

ভুবন সোম : উৎপল দত্ত ও সুহাসিনী মুলে

মৃণাল সেন ও তাঁর পারিপার্শ্বিক

দেবেশ ঠাকুর

ক. সাবালকত্বের পটভূমিকা।। ১৯৫৫ এবং

একসময় ইচ্ছা হয়েছিল, মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করব। বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। সরাসরি তাঁর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। না করেননি। বাড়িতে যেতে বলেছিলেন। আমাকে অনেকখানি সহযোগিতা করেছিলেন চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের শ্রীকান্ত। যথা দিনে ও সময়ে বাড়িতে হাজির। যথেষ্ট স্নেহ, ততোধিক প্রশ্রয়, তার থেকেও বেশি জলখাবার সহযোগে কথোপকথন চলতে থাকে। ওনার কতগুলি ছবি দেখেছি কেমন লেগেছে সমকালের প্রেক্ষিতে কেন উনি ব্যতিক্রমী এসব কিছু প্রথাসিদ্ধ প্রশ্নাবলির পর বললেন, তুমি ইংরেজি নিয়ে পড়েছ। সিনেমা ভালো লাগে বলেছ। ছোটখাটো ছবি করেছ। (তাঁর হাতে তখন দিয়েছিলাম আমার সদ্যপ্রসূত একটা চিত্রনাট্য। 'দংশন'। উনি পড়তে পড়তে কথা বলছিলেন।) তোমার কথা শুনে মনে হল, তুমি চ্যাপলিনের নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত। আমারও খুব প্রিয় চ্যাপলিন। তুমি যদি গবেষণা করো, চ্যাপলিন নিয়ে কাজ করো। পরে তাই করেছিলাম।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃণাল সেনের প্রথম ছবি নিয়ে কথা উঠলো। 'রাতভোর'। খুব বিরক্তিভরা মুখে বললেন, ছবিটা কি আমি বানিয়েছি!

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। উনি বলে গেলেন, এই ছবিটার ইতিহাস আমি মন থেকে ভুলে যেতে চাই। কুল কিনারা পাইনা, কি করে এত বাজে একটা ছবি করার ইচ্ছে জেগেছিল। দুঃখের বিষয় কি জানো, আমার সিনেমার বিবলিওগ্রাফি লিখতে বসলেই প্রথমেই এই অপকর্মটির নাম মনে আসবে।

'রাতভোর' ছবিটির জন্মকাল একটু বিচিত্রধর্মী। ১৯৫৫। এই ছবিটির পাশাপাশি আরও দুটি তথ্যচিত্র তিনি নির্মাণ করেন এই বছর। দা লাইফ অফ আদিবাসীজ এবং প্লেসেস অফ হিস্টোরিক ইম্পরট্যান্স ইন বিহার।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ভৌমিক বাংলা সিনেমার ইতিহাস নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ একটি বই লেখেন ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে। 'সোনার দাগ'। গবেষণার কাজটি বহুদিন থেকে করছিলেন। ভারি চমৎকার বই। বায়োস্কোপ, অমরেন্দ্রনাথ, হীরালাল-মতিলাল থেকে শুরু করে শেষ করেছেন অদ্ভুত এক যুগসন্ধিক্ষণে। ১৯৫৫। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী। স্টুডিও পাড়া থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আউটডোরে বেরিয়ে আসা পুরো দল। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলা ছবির মর্যাদাময় পরিচিতি। মানব জীবনের দলিলের দিক দিশা।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ভৌমিক '১৯৫৫ সালের ছবি পথের পাঁচালী পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলা ছবির একটি নতুন যুগের সূচনা কাল পর্যন্ত' পৌঁছে বইটি শেষ করেছেন। এই সময় মৃণাল সেন একটি মন্তব্য করেন। 'রাতভোরে' ব্যর্থতার বেদনা কি এখানে ফুটে উঠেছে?

''পথের পাঁচালী জনপ্রিয় ছবি সন্দেহ নেই। কিন্তু ওটা দৈত্য কুলে প্রহ্লাদের মত। অপরাজিত চলেনি এটা ভুললে চলবে না। চলবে না আরো বহু সৎ ছবি- এদেশে ও বিদেশে। কিন্তু বিদেশের বাজার অনেক বড়, এটাই বাঁচোয়া।" চিত্রভাষ।। পথের পাঁচালী সংখ্যা।

এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরো দুটি বক্তব্য তুলে ধরা যায়। অচলপত্র পত্রিকায় দীপ্তেন সান্যাল নীলকণ্ঠ ছদ্মনামে লিখেছিলেন,''... সাবজেক্টের অভাব নেই, সত্যজিৎ রায়ের মতো লোকের..... আলোছায়ার এই মিডিয়াম মিডিওক্রিটি থেকে উত্তীর্ণ হোক ক্লাস-এ।" দৈনিক বসুমতী লিখেছিল, ''...

সমস্ত কনভেনশন ভেঙে নতুন কিছু করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে নেমেছেন সত্যজিৎ রায়। সোনার দাগ।।৩৯৪।

আমাদের মনে রাখা দরকার সত্যজিৎ এর থেকে বয়সে চার বছরের ছোট, মৃণালের থেকে দু বছরের ছোট ঋত্বিক ঘটক ১৯৫২ য় নির্মাণ করে ফেলেছেন আরেকটি ব্যতিক্রমী ছবি। নাগরিক। ছবিটি আর্থিক ইত্যাদি কারণে মুক্তি পেতে আরো দুটো দশক লাগবে। ইতিমধ্যে এক বছরে (১৯৫৮) তিনটি অসামান্য ছবি নির্মাণ করে ফেলবেন ঋত্বিক : অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, বাড়ি থেকে পালিয়ে। অন্যদিকে মৃণাল সেনের 'রাতভোর' এর চরমতম ব্যর্থতার পর পরপর তিন বছর কোন ছবি মুক্তি পায়নি। পরিচালকের পুত্র কুণাল সেন লিখছেন ''রাতভোর। পরে ওই ছবিটির কথা উঠলেই বাবা তা উড়িয়ে দিতেন, ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।" দেশ।। ১৭ মে, ২০২৩। আমার মনে হয়েছে, এই '৫৫ সালটি অনেক দিক দিয়ে, বিশেষত মন ভাঙ্গাগড়ার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মৃণাল সেনের কাহিনিকেন্দ্রিক অন্যান্য ছবিগুলি যথেষ্ট উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং পরিচালক এগুলো সম্পর্কে পরবর্তীকালে নির্মোহ ছিলেন। এগুলি নীল আকাশের নিচে (১৯৫৯), বাইশে শ্রাবণ (১৯৬০), পুনশ্চ (১৯৬১), অবশেষে (১৯৬৩), প্রতিনিধি (১৯৬৪), আকাশ কুসুম (১৯৬৫ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত রীতিমতো বক্স সফল ছবি), কাচকাটা

হিরে (১৯৬৬), মাটির মনিষা (১৯৬৬ ওড়িয়া ছবি), জোড়া দিঘির চৌধুরী পরিবার (১৯৬৬)। অতঃপর ভুবন সোম (১৯৬৯)। 'বনফুলের গল্প। উৎপল দত্ত, সুহাসিনী মূলে প্রমুখের স্মরণীয় চরিত্র চিত্রন এবং মৃণাল সেনের অনবদ্য নির্মাণে ভুবন সোম উজ্জ্বল হয়ে আছে।' অশোক মুখোপাধ্যায়।। দেশ, ১৭ মে ২০২৩। মৃণাল সেন নিজে বলতেন, এক সোম (গীতা) একদিকে বাঁচিয়েছেন, আর এক সোম (ভুবন) চলচ্চিত্রে।

১৯৫৫ প্রসঙ্গ যখন এলো, আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। এই বছর আমাদের যতটা দিয়েছে, কেড়েও নিয়েছে অনেক কিছু। একজন অভিনেতা প্রসঙ্গে বলছি দৈনিক বসুমতী থেকে। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবির সমালোচনা করতে গিয়ে পত্রিকার চিত্রসমালোচক লিখছেন, ... ''সতীর মৃত্যুর পর পটাপট যেই সব একধার থেকে চৈতন্য লাভ করতে লাগল অমনি গল্পটির অপমৃত্যু ঘটলো।..... নামক ভদ্রলোকটিকে কি কারনে ছবিতে নেওয়া হয় বুঝতে পারলাম না। ইনি অভিনয়ের তো কিছুই জানেন না।" সোনার দাগ।। ৩৮৬।

যে 'ভদ্রলোকটি' অভিনয়ের কিছুই জানেন না তাঁর নাম উত্তমকুমার। উত্তর কালে সত্যজিৎ রায় যাকে অভিনয় করিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, বাংলায় 'নায়ক' বলতে যদি কেউ থাকেন তিনি উত্তম কুমার। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে নয়, সমালোচকের অর্ঘ্য-হস্ত যখন খড়গ-হস্ত হয়ে যায় তখন শিল্প সংস্কৃতিতে কিছুটা হলেও বিপন্নতা আসে। প্রথম ছবিতেই মৃণাল সেনের যে বিপন্নতা, সত্যজিৎ রায়ের বিপন্নতা এসেছিল অপু ট্রিলজির দ্বিতীয় ছবিতে। 'অপরাজিত' ভালো ছবি। কিন্তু বাণিজ্য সফল নয়। একাধারে চিত্রশিল্পী, সংগীতজ্ঞ, কাহিনিকার সর্বোপরি উপেন্দ্রকিশোর- সুকুমারের অলোকসামান্য ঘরানার অনুপম উত্তরাধিকারী মণি-'মানিক' যা পেয়েছিলেন, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর থেকে কলকাতায় এ- বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়ানো প্রায় ছিন্নমূল মৃণাল সেন তখন লড়ছেন বাস্তুর জন্য। মাস্তুল ভাঙা হাল ভাঙা পাল ছেড়া মানুষটির তখন অন্নচিন্তা চমৎকারা। কুণাল সেন জানিয়েছেন, ১৯৫২-৫৩ সাল নাগাদ পার্ক সারকাস অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। রোজগার পাতি নেই, জীবিকার দিশা নেই। কিন্তু বিয়ে করে ফেলেছেন। গীতা ''খালি পায়ে শ্বশুর বাড়ি এসেছেন। এখানে তার পরার মতো আর কোনো চটি নেই। একটিই গয়না ছিল মায়ের, কয়েক দিন বাদে বাবা সেটা নিয়ে নিলেন। বন্ধক রাখতে হবে, টাকা জোগাড় করবেন সংসার চালানোয় ওঁর অংশ হবে সে টাকা।" দেশ।। ১৭মে ২০২৩

১৯৫৫-য় রাতভোরের সারারাত শুটিং সেরে বাড়ি ফিরলেন। সেদিনই অন্তঃসত্ত্বা গীতার সন্তানের জন্ম দেওয়ার কথা। ক্লান্তির শেষে একটু বিশ্রাম নিয়ে যখন নার্সিংহোমে আসেন দেখলেন অভিমান করে শুয়ে আছেন স্ত্রী। জিজ্ঞেস করলেন, কখন হবে? উত্তর পেয়েছিলেন, হয়ে গেছে।

ছবি নির্মাণে যিনি এতটা গোছানো, এতখানি আন্তর্জাতিক, এতখানি সূক্ষ সংসার জীবনে তিনি কি বোহিমিয়ান? এবার আসছে ৫৫-'৫৬ র পরিপ্রেক্ষিতে তিন কালজয়ী স্রষ্টার শিল্প নির্মাণে এবং বিনির্মাণে যাপনের অভ্যাস প্রণালী। সত্যজিৎ ভবিষ্যতে কি ছবি করতেন সে নিয়ে দ্বিমত আছে। অন্তত পথের পাঁচালী করতেন না। রেঁনোয়ার ছবির গাছ নদী লণ্ঠন পাড়ভাঙ্গার শব্দ জোছনায় নৌকার দোলন কলাগাছ মোচা জলের উপর তার দোদুল্যমান ছায়া... যেন জীবনানন্দের কবিতার মত দৃশ্যের জন্ম হয়। এটি বোধহয় পথের পাঁচালীর বীজ। পুকুরের পাশে বসে মাছ ধরা, ইন্দ্রলুপ্ত মানুষটির মাথায় প্রথম বারিপাত, পদ্মপুকুরে জল পিপির সঙ্গে পদ্ম পাতার নালভাঙা নাচন। মানিকবাবুর মনও নেচে উঠছে। হয়তো নেপথ্যে নাচিয়ে চলেছেন নন্দলাল- বিনোদ বিহারী, শান্তিনিকেতনের খোয়াই।

মৃণাল এবং ঋত্বিক পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এলেন। পূর্ব বঙ্গ তাদের ছাড়লে না। দেশভাগ পুরনো পাঁচড়ার মত চেপে বসে

রইল। সত্তার ভিতর সত্যের আর্তনাদ অবচেতনে ধাক্কা দেয়, আমাদেরও ঘর ছিল। পূর্ববঙ্গে বাড়িকে বলে বাসা। এ বাংলায় বাসা মানে অস্থায়ী আবাসন। ঘর আর বাসার মধ্যে যে শব্দ বৈচিত্র্য, তাই ত্রয়ীর ছবির সঙ্গ এবং অনুষঙ্গ।

উত্তরণ এবং অবতরণের তিনটি দৃশ্যের কথা কল্পনা করুন। সীমাবদ্ধ-তে শ্যামলেন্দু সিঁড়ি ভেঙ্গে যখন উঠছেন খুব তড়বড়িয়ে পরপর অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে গেলেন। তারপর ক্লান্ত হতে থাকেন। এ অন্তর্গত রক্তের ভিতরে ক্লান্তি। মেঘে ঢাকা তারায় নীতা সিঁড়ি দিয়ে তড়িঘড়ি উঠে গেল। প্রেমিককে দেখল বোনের সঙ্গে। ক্লান্তি আর অবসন্নতা নিয়ে নামতে থাকে। শপাং সপাং করে চাবুকের শব্দ। আকাশ কুসুমে সৌমিত্রর সব মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার পর, সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে আসার পর রাস্তা দিয়ে মানুষটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। একটা বিন্দুর মতো অস্তিত্বহীন বিপুল প্রাণ। তিনটি ট্রিটমেন্ট আলাদা। পর্যায় পরম্পরা স্বতন্ত্র। দর্শনে অবসন্নতা। বিপন্ন বিশ্বাসের পা টেনে টেনে চলার ছন্দে হেমন্তের অরণ্যে পোস্টম্যানকে দেখতে পাই।

খ. মেইন স্ট্রিম, বাণিজ্য বনাম কুশলী কলা

পথের পাঁচালীর সাফল্যের পর কুশলী কলার ঢেউ সামান্য হলেও থিতু হয়ে গেল। অন্যদিকে বাণিজ্যিক শিল্পের বাজারে তখন রমরমা। '৫৫-য় অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনায় অগ্নিপরীক্ষা' দারুন বাণিজ্য সফল ছবি। সুচিত্রা-উত্তমের চিত্র। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুচিত্রা সেনের ঠোঁটে যখন দর্শক-শ্রোতা' গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু শুনছেন। তার রেশ চলছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। সাধারণ দর্শক (টিনের তলোয়ার নাটকে বেনীমাধব চাটুজ্জে যাদের বলেছেন থিয়েটারের ঈশ্বর) এক বারও বিচার করে না, সুচিত্রা সেনের পিছনে পাহাড়ের আঁকা সিনটি অপটু হাতেরই শুধু নয় অবিশ্বাস্য। কিন্তু কাহিনি সংগীত আর প্রেম যেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দর্শক বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন কুয়াশা ভরা পাহাড় থেকে যে কোনো মুহূর্তে নায়িকা পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারেন। আবেগের সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভূতি, সংসার যাঁতায় পিষ্ট যারা কল্লোল থেকে নবকল্লোলে এসেছেন এদের কাছে সব সত্যি। ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি, করালকুন্তীর সত্যি, এন টি ওয়ানের সেই ছোট্ট ডোবাটি দুর্গাদাস-উমাশশীর অজয় নদী হতেও আপত্তি নেই। বিশ্বাসে মিলায় জুবিলী, অবিশ্বাসে ফ্লপ।

বুঝতেই পারছি, বিকল্প ছবিকে বিপুল বিক্রমে লড়াই করতে হয়েছে প্রতিটি পদক্ষেপে। বারবার আঘাত এসেছে আবেগের চেহারা নিয়ে। যুক্তির সিংহদ্বারে আঘাত হেনেছে। কোন কোন সময় মৃদুমন্দ আপোস করে তৃতীয় একটা সূত্র বার করার চেষ্টা হয়েছে। আটের দশকে এই আপোস কোন কোন ক্ষেত্রে পা- পোশ হয়ে গেছে।

আমার এক সহকর্মী সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করতেন, ছবিগুলো করতে অনেক খরচ। কিছুটা পয়সা তোলার জন্য সরকার পুরষ্কার দিয়ে খুশি করে দেয়। পাবলিক দেখে না। সরকারের ভর্তুকিতে চলে। তিনি নাকি অযান্ত্রিক দেখে তিনটি আর অভিযান দেখে তিনটি ঘুমের ওষুধ খেয়েও তিনরাত ঘুমেতে পারেননি। শুধু ভাঙা গাড়ির স্বপ্ন দেখেছেন।

সত্যজিৎ রায় 'অপরাজিত'র বাণিজ্যিক অসফলতার পর নিজস্ব পরিসরে একটা সমীক্ষা করে বুঝলেন, প্রথমত ছবি বারবার ফ্লপ হলে ছবিতে টাকা ঢালবে না প্রযোজক। দ্বিতীয়তঃ ছবিতে গানের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ আছে বাঙালির। তত্ত্বটিকে লুফে নিলেন। তারাশঙ্করের গল্প নিয়ে নির্মাণ করলেন জলসাঘর। কাল ছবিটির সাংগীতিক দিকটি বহুমুখী। বিসমিল্লাহ খানের অসামান্য সানাই। বিলায়েত খানের সেতার। রওশনকুমারী আছেন। ভেঙে পড়া জমিদার বাড়ির বুনিয়াদ, পাশাপাশি উঠতি বড়লোকের রুচিহীন প্রতিযোগিতা, সব মিলিয়ে বহুমাত্রিক নির্মাণ। যে

যেমন খুশি, যে কোন কোণ থেকে গ্রহণ করতে পারে। দর্শকের রুচি এবং চাহিদার কাছে কখনও কখনও পরিচালককে পৌঁছে যেতে হয়। পরিচালকের কাছে দর্শকের পৌঁছানোর তাগিদ আপাত আপেক্ষিক।

জলসাঘরের নির্মাণ কাল ১৯৫৮। এই ছবিতে গানের ব্যবহার করতে গিয়ে সত্যজিৎ পরে বুঝেছিলেন গান খুব একটা বড় অংশ নিয়ে তাঁর কাছে আসতে চলেছে। এবং তাঁর পছন্দের গান সুর শব্দ তিনি নিজেই নির্মাণ করবেন। তাই ফ্যান্টাসিতে চলে গেলেন। গুপি বাঘা সিরিজে। এর আগে পরে একটি দুটি গান লিখেছেন। কিন্তু সেগুলি চলচ্চিত্রের তাগিদে। যেমন চিড়িয়াখানায় 'ভালোবাসার তুমি কি জানো।' ১৯৬০ সালে ঋত্বিক ঘটকের ছবি মেঘে ঢাকা তারা। এই ছবিতেও গান বহুমাত্রিক এবং ব্যপ্ত। ছিন্নমূল মানুষগুলির বস্তির মত পরস্পর সংলগ্ন বাড়িগুলিতে বাউল ফকিরেরা গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের গানে দেশভাগের যন্ত্রণা আছে। এরা হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে। দেশভাগের যন্ত্রণা চমৎকার ব্যবহার করেছেন ঋত্বিক। আপনভোলা শাস্ত্রীয় সংগীতে ডুবে থাকা মানুষটির (অনিল চট্টোপাধ্যায়) জ্ঞান আর গান সমার্থক। অনেক না পাওয়ার বিষন্নতা রাগ আলাপগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। আর নীতা যখন দাদার কাছে গান শিখতে চায় তখন একটি গানই বেরিয়ে আসে, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে। আবার শেষ অবধি টেনে নিয়ে যান যক্ষা রোগগ্রস্ত বোনকে যক্ষের অলকাপুরীর কাছাকাছি। তখন শহরের উপকণ্ঠের বস্তি-বাড়ি নয়। প্রথমে বিভক্ত বাংলাদেশের বাসা। অতঃপর গোটা বিশ্ব চরাচর হাতে এসে ধরা দেয়। পাহাড় নিজেই যেন গান গেয়ে ওঠে, আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ। আমার স্থির বিশ্বাস, (যার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না।) রবীন্দ্রগানকে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটকের যেমন বিকল্প নেই, বিকল্প নেই দেবব্রত বিশ্বাসের। প্রতিটি গান এখানে নোয়ার জাহাজের মত অসংখ্য প্রাণকে একত্রিত করছে। যুক্তি তক্কো আর গপ্পো-এ কেন চেয়ে আছো গো মা মুখপানে যেন চিত্রনাট্যের অনিবার্য অংশ। কিংবা কোমল গান্ধারে। অথবা সুবর্ণরেখায় পরিত্যক্ত বিমানভূমিতে ধানের ক্ষেত খুঁজে পাওয়া। ১৯৫৮ য় মৃণাল সেন নির্মাণ করেন নীল আকাশের নীচে। এই ছবিতেও গান ছবিটির উপকরণ না হয়ে প্রকরণ হয়ে গেছে। মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে গৌরীপ্রসন্ন-হেমন্তের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক লাবণ্য পেয়েছে। গানের ক্ষেত্রে মৃণাল সেন আমেচারের ঝুঁকি নিতে চাননি। অবশ্য সত্যজিৎ এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। গানের উপর অগাধ নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে রবীন্দ্রগান গাওয়াচ্ছেন কিশোরকুমারকে দিয়ে। গুপির জন্য নিয়ে আসছেন নবাগত অনুপ ঘোষালকে। গান গেয়েছেন চুনিবালা দেবী। পাহাড়ী সান্যাল গেয়েছেন অরণ্যের দিনরাত্রিতে। কাঞ্চনজঙ্ঘায় গাইয়েছেন নেপালি বালককে দিয়ে। নিজেই আগন্তুকের গান গেয়েছেন উত্তর কালে- অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ। এক্ষেত্রে দেখা গেল ১৯৫৮ য় নির্মিত ত্রয়ীর ছবিতে গান যেমন একটা বাড়তি মাত্রা জুগিয়েছে উত্তর কালেও গানের ভূমিকা সুষম।

একবার তরুণ মজুমদার কে প্রশ্ন করেছিলাম, এই যে আপনাদের নায়ক নায়িকা হঠাৎ করে পাহাড়ে জঙ্গলে নদীতে গান গেয়ে উঠলো, সে অবশ্য গাইতে পারে, কিন্তু আশপাশ থেকে বেহালা এসরাজ পিয়ানো ঢাক ঢোল তবলা ইত্যাকার যন্ত্রানুসঙ্গ বাজতে থাকলো এর ঠিক উৎস বোঝা যায় না। উনি বলেছিলেন, ধরে নাও না এটা একটা সাপোর্টিং মিউজিকাল এম্বিয়্যান্স।

রাতভোরের ব্যর্থতার পর আরো কিছু সময় চলে গেল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় মৃণাল সেন পরিচালনা করলেন নীল আকাশের নিচে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গানের মানুষ। ছবিতে ব্যবহার করলেন গান, ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে। মৃণাল সেন লাফিয়ে উঠলেন, আমার ছবিতে গান। কিছুতেই মানবেন না। মধ্যস্থতা

করলেন মৃণাল সেনের পরিবারের আত্মীয় অনুপ কুমার (দাস)। স্বাভাবিক। অনুপ কুমারের বাবা ধীরেন দাস গানের লোক। অন্য গানটি নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবী একটি মাইলফলক হয়ে গেল। ছবিটি মোটামুটি বাজার পেলেও মৃণাল কিন্তু গানের প্রয়োগ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির খুব বেশি পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ দেননি।

এতোদিনে দর্শক ঠিক করে নিয়েছেন, কে কোনটা কেমন হবে গ্রহণ করবেন। ভারতীয় গ্রন্থাগারের তত্ত্ববিদ রঙ্গনাথন জানিয়েছিলেন, এভরি রিডার ইটস বুক। এভরি বুক ইটস রিডার। সব ছবির দর্শক আছে। সব দর্শকের ছবি আছে। চ্যাপলিনের গ্রেট ডিক্টেটরের প্রথম শ্যো হওয়ার সময় দর্শক আসন ফাঁকা হয়ে গেছিল। ইতিহাসের দিকে দেখতে গেলে আমেরিকা তখন হিটলার এবং বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে ভাবিত ছিল না। টেকনোলজির দিকে দেখলে এই ছবিতে সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্ব বাজারের দিকে দেখলে পৃথিবীর সবচাইতে ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারীকে নিয়ে মজা করাটা দর্শকের কাছে জুতসই মনে নাও মনে হতে পারে। তাই ছবিটি চলাকালীন বাইরে চ্যাপলিন অস্থির ভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন। তাহলে লোকে কি ছবিটা দেখবে না। শেষে একজন দর্শক বেরিয়ে এলেন। চ্যাপলিনের হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, আউটস্ট্যান্ডিং। ভাবখানা এমন, এটাই আগামী দিনের মাইলস্টোন হবে। দর্শকের নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। পরে গ্রেট ডিক্টেটর বিশ্বব্যাপী বাজার করতে সক্ষম হয়। ছবিটির কমিটমেন্টের জন্য।

বাংলা ভাষায় সমান্তরাল রেল লাইনের মত দু ধরনের ছবি চলছিল। প্রমোদের জন্য প্রমোদ। শিল্পের এবং দায়বদ্ধতার জন্য চিত্র নির্মাণ। এই ঝামেলা বলিউড ছবিতে নেই। ধরতি কি লাল-এর মত কিছু ছবি নির্মাণ হলেও ছবির ভাষা, নির্মিতি, গানের ব্যবহার, স্বতন্ত্রভাবে সংলাপ রচনা ও ব্যবহার সবমিলে বোম্বে তখন ছবির মস্ত বড় বাজার। বোম্বাইয়ের বোম্বেটের জটায়ু জানিয়ে দিলেন, কলকাতায় মান আর বোম্বেতে মানি। মান ও মানির বৈপরীত্য ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে সমান্তরাল ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয়। হলিউডের ছবিতেও সমান্তরাল ছবি নির্মাণের দ্বৈতসত্তা নেই। বার্থ অফ নেশন থেকে স্পিলবার্গের সাদাকালো ছবি সিনডলার্স লিস্ট অথবা ক্যামেরনের অবতার কিংবা ক্রিস্টোফার নোলানের ওপেনহাইমার। বিদেশে শিল্পী এবং চলচ্চিত্রের মূল প্যারামিটার এন্টারটেইনমেন্ট। শিল্পীরা এখানে এন্টারটেইনার। প্রমোদপ্রদায়ক। শব্দবন্ধটি মন্দ শোনালেও আপাত সত্যি। প্রযোজক পয়সা ঢালবেন। এক সপ্তাহ ছবি চলার পর বন্ধ হয়ে যাবে। খবরের কাগজে প্রচুর সুখ্যাতি বেরোবে। এমনতর ভাবাটা যেমন ঠিক নয় তেমনই কিরানা ঘরানা, মাইহার ঘরানা ইত্যাদি সাংগীতিক প্রতিষ্ঠানকে আমরা ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারিনা। ঠিক তেমনই ইনভেসমেন্ট এন্ড প্রফিট তত্ত্ব বাংলার সমান্তরাল ছবির জগতে চলত না। ফলে সপ্তপদী, হারানো সুর, সবার উপরে ঝমঝম করে চলতে থাকে। জুবিলীর পর জুবিলী হয়। টিকিট ব্ল্যাক হয়। ব্ল্যাকাররা বড়লোক হয়। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসে হুব্বা শ্যামল। টিকিট ব্ল্যাক না হলে কি আর ছবি হল। পথের পাঁচালী দেখার সময় সুনীল শক্তি-সন্দীপনদের মিছিল করে লোককে বারবার বলতে হয়েছিল, ছবিটা দেখো।

বাংলার চিত্র নির্মাণে বারবার এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। দ্য সিকার বাইসাইকেল থিপ্ হারানোর গল্প। একবার সাইকেল। আরেকবার সন্তান। ব্যাকগ্রাউন্ড ইতালির বাণিজ্যিক মন্দা। মানুষ উন্মুখ হয়ে দেখেছিল। আকিরা কুরোসভার ছবিতে বারবার বড় বড় প্যানোরামা দেখেছি। মানুষ তাও গ্রহণ করেছে প্রাণ ভরে। আমাদের সেই সুযোগ ছিল না। যার শিক্ষা সৌকর্য ছিল তার জন-অর্থবল ছিল না। এইজন্যেই মূলত গড়ে উঠেছিল সিনে সোসাইটি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, সিনেমা মানে স্রেফ এন্টারটেইনমেন্ট নয়। আরো কিছু। বছরে একবার দুবার আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উৎসব হতো।

চলচ্চিত্র উৎসব। হরিবল্ বলবো না হরিবোল বলব ভেবে ঠিক করতে পারছি না। পরিষ্কার বলছি, এইসব উৎসবের মাথায় যারা বসে আছেন তাদের মাথায় চলচিত্র নেই। সেকালে মানুষ আইজেনস্টাইন, ফেলিনি, দ-সিকা, লরেন্তিস, কুরোশোয়া দেখে বিশ্ব চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতি জানতে পারত। বিশ্ববরেণ্য পরিচালকেরা আসতেন। তাদের ছবির নির্মিতি ও নির্মাণ প্রকৌশল সম্পর্কে মতামতের আদান-প্রদান হত। কান ফেস্টিভ্যাল, বার্লিন ফেস্টিভ্যাল নিয়ে বিস্ময়কর খবর পাওয়া যেত। এখন বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করতে করতে অমিতাভ বচ্চন এবং শাহরুখ যান ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ইন্ডোরের দর্শক অক্লান্ত। মুফতে যদি ম্যায় হুঁ না-র নাচাগানা আরেকটু ভালো দেখা যেত মন্দ হতো না।

পাঁচ-এর দশকের শেষে মানুষ হারানো সুর দেখেছে, নীল আকাশের নিচে দেখেছে, জলসাঘর দেখেছে সুবর্ণরেখা দেখেছে। যে যার মত করে। যে যার বিশ্বাসে। যে যার অনুভূতিতে। এখন অবশ্য ছবির মন্দা। ও টি টি প্ল্যাটফর্ম আর মাল্টিপ্লেক্স থিয়েটার ছবি দেখানোর পৃথক সংজ্ঞা এনেছে। ভালো ছবি নির্মাণের আগ্রহ বেড়েছে। মৃণাল সত্যজিৎ ঋত্বিক এই সুযোগটা পাননি। আরো দুঃখের বিষয়, তামিলনাড়ু ছাড়া সারাদেশে দিনে একটি করে সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাঙালির অস্মিতাকে একটু খড় চাপা দিয়ে বলছি, দক্ষিণের সিনেমা, বিশেষত মালায়ালি, আজ ভারতের প্রযোজকদের কাছে দৃষ্টান্ত।

আমরা ঠেক আলো করে তর্ক করতাম কমার্শিয়াল ছবি আর আর্ট ফিল্ম নিয়ে। এখন সুক্ষ তারতম্য ঘুচে গেছে। রড সিমেন্টের ব্যবসার মতো চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি না হতে পারে। তবু তার শিল্পগত দিক থাকবেই। শিল্পের দুটি ইংরেজি প্রতিশব্দ- আর্ট মানে ইন্ডাস্ট্রি মানে শিল্প। সিঙ্গুর হলে সিঙ্গার গান পাবেন। দুই মিলে পৃথিবীর আদিতম রস, শৃঙ্গার।

গ. সত্তার সঙ্গে সত্যের দ্বন্দ্ব: মৃণাল ভার্সেস মৃণাল

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে একটি সুন্দর বাক্যবন্ধ নির্মাণ করেছেন (রচনার অসামান্য প্রসাদগুণ থাকলেও।) তাঁহার গৃহিনীপনা ছিল না। সৃজনশীল সকলেই রান্না-বান্না করছেন। সকলেরই উপকরণ বা ইনগ্রেডিয়েন্টস মোটামুটি প্রায় এক। সবজি তেল নুন ঝাল মশলা সব এক হওয়া সত্ত্বেও চারজনের রান্নার স্বাদ আলাদা। এই আলাদা সাধের স্বাদু কৃৎকৌশলের নাম গৃহিণীপনা।

সিনেমা তৈরির ইনগ্রেডিয়েন্স কমবেশি সকলেরই এক। ক্যামেরা সাউন্ড ট্র্যাক আলো অভিনেতা। এখানে একজন গৌরী সেন দরকার। তার নাম প্রযোজক। হীরালাল থেকে শুরু করে সত্যজিৎ মৃণাল ঋত্বিক তপন হয়ে অগ্রদূত অগ্রগামী দীনেন গুপ্ত অজয় কর থেকে প্রভাত হরনাথ। প্রবাহিত নদী। কখনো পদ্মানদীর বন্যা কখনো শুকিয়ে যাওয়া তিতাস। প্রলয়োপয়োধিজলে নিমজ্জিত প্রজ্ঞাস্বরূপ 'গৃহিণীপনা'-চলচ্চিত্র নির্মাণের বেদ-বিধি গুলিকে উদ্ধার করলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। প্যারালাল ছবির প্রথাসিদ্ধ সংজ্ঞাটি এবার মুখ থুবড়ে পড়ল। সোজাসাপ্টা কথা হলো, ভালো ছবি, মন্দ ছবি। আমাদের ছাত্র জীবনে সোচ্চারে উচ্চারণ করতাম, সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি। আজ আরও সোচ্চারে বলি, অপসংস্কৃতি বলে কোন শব্দ হয় না। সংস্কৃতি মানেই চারু। তার আবার 'অপ' কোথা থেকে হয়। চতুষ্টয়ের যুগের পর কিছুকাল ছিল মুষল পর্ব। যাত্রার সংলাপ ছবিতে এসে বসত। এরপর হারিয়ে গিয়ে সোনার টিয়ে ফিরে এসেছে। মধ্যকালের আধা 'পর্নো' ঋতুপর্ণের মননের ট্রিটমেন্টের প্রসাদগুনে যে সত্ত্বা পায় তার উত্তরাধিকার বয়ে চলেছেন কৌশিক- সৃজিত- সুজিত- অনীক শিবপ্রসাদ নন্দিনী- কমলেশ্বর প্রমুখ। এদের গৃহিণীপনার মূল শক্তি ঐতিহ্যের সঙ্গে আগামীকে জুড়ে দেওয়া।

এই কাজটি অনেক আগে করেছিলেন মৃণাল সেন। ত্রিকালকে একটি কালমাত্রায় বাঁধা। এখন মৃণালের কয়েকটি ছবি নিয়ে গৃহিণীপনার আপাত দৃশ্যমান টানা-ভরণের পটভূমি নির্মাণ করা যেতে পারে। এই কয়েকটি ছবি অসামান্য স্রষ্টার ট্রেডমার্ক না হতেও পারে। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কালানৌচিত্য ঘটতেই পারে। আমাদের বিষয় এখানে হতে পারে ট্রিটমেন্ট।

প্রথমেই আলোচনার মধ্যে আনা যাক ভুবন সোম। ছবিটি নিয়ে আগে পরে কিছু আলোচনা হয়েছে। মৃণাল সেনের সার্থকতার মাইলস্টোন। দয়া করে সাফল্য এবং সার্থকতাকে মিশিয়ে দেবেন না। সফলতা খন্ড। সার্থকতা অখন্ড। ভুবন সোমের কাহিনিকার বনফুল। আপাদমস্তক ঋজু মানুষটির অনেক গল্প চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। অগ্নিশ্বর দারুন সফল। হাটে বাজারে দারুন সার্থক। সর্বত্র একটি ন্যায়পরায়ণ মানুষের নীতিজ্ঞ অবস্থান। ভুবন সোম মানুষটি অনেকটা শামুক জাতীয়। বাইরে শক্ত খোলস। ভিতরে নরম শাঁসযুক্ত প্রাণ। টিপিক্যাল প্রবাসী বাঙালি। টাইটেলে রেল লাইনের ছুটে চলার সঙ্গে রেলের গতিছন্দ, তবলার তাল, আলাপ, সরগম। বিজয় রাঘবের চমৎকার সুসমঞ্জস সাংগীতিক পরিমিতি। তার সঙ্গে অমিতাভ বচ্চনের ধারাভাষ্য। সকলেই জানেন, এককালে কলকাতা রেডিওর অ্যানাউন্সার হওয়ার স্বপ্ন থেকে ছিটকে পড়া অমিতাভের এটিই প্রথম সিনেমার কাজ। শোনা যায়, এ কাজের জন্য অমিতাভ পঞ্চাশ টাকা মজুরি পেয়েছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, এর কয়েক দশক পর সত্যজিৎ রায় শতরঞ্জ কা খিলাড়ি ছবির ধারাভাষ্যের জন্য পুনশ্চ অমিতাভকে ব্যবহার করেন। মোদি-শাহ জুটি খুশি হতে পারেন এই ছবির পটভূমিতে আছে গুজরাট। কলকাতার বাঙালিকে বনফুল যতটা না চিনতেন তার থেকে বেশি জানতেন প্রবাসী বাঙালিকে। সম্ভবত তার প্রধান কারণ, বাঙালির মহোত্তম ঠেক-কালচারের সঙ্গে বনফুলের পরিচয় ছিল না। ভুবন সোমেরও ছিল না। কাজের মানুষ। বস্তুবাদী এবং কর্তব্যপরায়ণ। প্রত্যন্তের রেল স্টেশনে স্টেশন মাস্টারের চাকরি খাওয়ার জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ। মূল গল্পটি বনফুলের অন্যান্য গল্পের মতই একেবারে ঋজু। সোজা সাপটা। মৃণাল সেনের উপস্থাপনায় প্রচুর মনস্তাত্ত্বিক বাঁক মোড়। সাধু মেহেরের বোকা বোকা চালাকির ভাব আর ভুবন সোমের বাঙালিঘেষা হিন্দির প্রকাশ-কখন, মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ বাংলায় আত্মকথন দুইয়ের সামঞ্জস্য সুষম। বহু বছর বাংলার বাইরে কাটিয়ে তিনি বাঙালি। বিনির্মাণে মৃণাল সেন অত্যন্ত সতর্ক। তাঁর টার্গেট দর্শকের মধ্যে হিন্দি ভাষাভাষীরা যেন কাঙ্খিত উপকরণ পান। বিশেষত সুহাসিনী মূলে (গৌরী) এখানে উজাড় করে দিয়ে লক্ষীর গৌরী সেন। ভুবন সোমের চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরিচালক কার্টুনের ব্যবহার করেছেন। রৈখিক অংকন। কেঠো বৃত্তি-যাপন। সীমাবদ্ধ রুটিন। বাংলা কিন্তু তখন কৃষ্টির সম্পদে বৈভবে প্রতুল। এখানে মৃণাল সেন ব্যবহার করলেন তার ইনগ্রেডিয়েন্টসের অন্যতম কোলাজ। সোনার বাংলা কোলাজের শুরু স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে। সমকালীন আধ্যাত্মিক অগ্রগামী বাংলার ট্রেডমার্ক। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ। কালচারাল বাংলার পথিকৃৎ। তারপরেই সত্যজিৎ। রবিশংকর। অতঃপর কমিউনিস্ট আন্দোলন। কাস্তে হাতুড়ি। কোলাজ নির্মাণে মৃণাল সেন অত্যন্ত ধনী। কার্টুন থেকে কোলাজ। তারপর প্যানারমিক শট। একজনের চাকরি যাওয়ার যন্ত্রনা। যন্ত্রযানে বসে ভুবন সোমের (উৎপল দত্ত) রেললাইন পরিদর্শন। ভীষণ কড়া মানুষ, অনমনীয়, স্থিতপ্রজ্ঞ, আমলাতান্ত্রিক, ডিউটি পরায়ণ, ভয়ংকর প্রাচীনপন্থী। মানুষটিকে যখনই ক্লোজ শটে ক্যামেরায় ধরা হচ্ছে ভীষণ একমাত্রিক মনে হচ্ছে। কে কে মহাজনের ক্যামেরা ভীষণভাবে গতিশীল। এখানে দৃশ্যপট যত না নড়ে ক্যামেরা অধিকতর চলমান। শট্ থেকে শটান্তরে যাওয়ার সময় প্রতিস্পর্ধী

চলাফেরা। ভুবন সোমকে বুঝতে হলে রেল লাইনের দিকে তাকালেই চলবে। সুক্ষ্মাতিসূক্ষ মাপে সমান্তরাল দুটি রেললাইন। পাশাপাশি কিন্তু কাছাকাছি নয়। ভুবন সোম সমান্তরাল রেল লাইনের মত নির্দিষ্টতার চলন পদ্ধতিতে রপ্ত। শিকারি রেল-আমলা পাখিদের সম্পর্কে ভালোভাবে পড়াশোনা করেন। তিনি বাল্মিকী নন। ক্রৌঞ্চ নিধন করতে পাখিদের সম্পর্কে পরিচিত হচ্ছেন। অতঃপর ক্যামেরার এঙ্গেল পরিবর্তিত হয়। গ্রাম বালিকা গৌরীর সঙ্গে পরিচিতি। ভুবন সোম এখন আনন্দ। যেন তৃষ্ণার্ত। গৌরী এখন প্রকৃতি। ঘন নিবদ্ধ শস্য ক্ষেত চিরে ছুটে যাওয়া। ক্ষেত শেষ হতেই আদিগন্ত বালিয়াড়ি। বালির সমুদ্র। প্যানোরামা বাড়তে থাকে। প্রকৃতি বেড়ে বেড়ে যায়। মানুষগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়। বন্দুক সরে যায়। টোটার বাক্স ছিটকে পড়ে। হননের জন্য পাখিদের জীবনযাত্রা চিনছিলেন। এবার চিনলেন মননের জন্য। ঘাতকের পোশাক সরে গিয়ে পাখিদের ভালোলাগার পোশাক এখন গায়ে। একটু একটু করে ভুবন সোম ভবন ছেড়ে ভুবনের কাছে এসে দাঁড়ান। তখন তাঁর সামনে চরাচর। যে চরাচর মানুষের। মনুষ্যতর সকল জীবের। সকল বৃক্ষের। মূল গল্পের গতিপ্রকৃতি সোজাসাপ্টা। ছবিটির গতি প্রকৃতি প্রতিমুহূর্তে ইঙ্গিতবাহী। আমার দেখতে দেখতে এক সময় মনে হয়েছিল টি এস এলিয়টের কবিতা। উপনিষদের ঋষির মত বলতে চাইছে, দত্ত দয়োধ্বম দময়ত।

পরের ছবিতে আসব সাতের দশকের নগর কলকাতায়। ছবির নাম পদাতিক। কলকাতা ট্রিলজির ট্রেডমার্ক ছবি। যার ট্যাগলাইন, 'কলকাতা চলেই চলেছে'। সত্যজিতের যদি সৌমিত্র হন, মৃণাল সেনের খুব প্রিয় চরিত্র ধৃতিমান এবং অঞ্জন। পদাতিক অসংখ্য কোলাজের সমাহার। সব কোলাজ গতিশীল। হাঁটছে। দৌড়াচ্ছে। পালাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই কোলাজ ভাঙা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কালোবাজারি দেউলিয়াপনা প্রবল বেকারি পরীক্ষা ভন্ডুল আত্মহত্যা। দুটি বিখ্যাত ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য পাই। বাইসাইকেল থিফের প্রথম শট আর মসিঁয়ে ভের্দুর যুদ্ধোত্তর মন্দা। তবু কলকাতা চলছে। কলকাতার থেকে বেশি দ্রুতগতিতে ছুটছে ক্যামেরা। সুমিত ছুটছে। তার থেমে থাকার জো নেই। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন চলমান। অনেকটা স্থির সিমি গেরওয়াল। তার চোখের সামনে ঘর সংসার গেরস্থালি যাপন ইত্যাদি স্থাবর স্বপ্ন। মানুষের অবস্থার রূপান্তর। অবস্থানের রূপান্তর। কলকাতা দ্রুত থেকে দ্রুততম গতিতে যত দৌড়চ্ছে তার থেকে বেশি ছুটে চলা ধৃতিমানের। একটু আগে ভুবন সোমের প্রসঙ্গ এসেছিল। বিপুল চরাচরের মধ্যে লাবণ্যময় প্রকৃতি সম্পদ। তার সঙ্গে তন্নিষ্ঠ ব্যষ্টি-যাপন। পদাতিকে সমষ্টির মধ্যে অনেকগুলো 'আমি'র সংঘাত। এখানে হেঁটে যাওয়াটা পৃথিবীর গতির সঙ্গে। গ্লোবাল পেস্। এই চলার সঙ্গে বিশ্বজুড়ে চলছে মুক্তিকামী মানুষের দৌড়। তার সঙ্গে কখনও সহযোদ্ধা আছে। কখনও নেই। এই সংজ্ঞাটি মৃণাল সেনের নিজস্ব। তাঁর কমিউনিজম যতটা সামষ্টিক তার থেকে বেশি ব্যক্তিগত। এই মতি ছিল চ্যাপলিনের। এ বিষয়ে নানা লেখায় মৃণাল সেনের যেরকম অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তার খানিকটা স্বকৃত বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। সাতের দশক হয়ে উঠেছিল সাথীর দশক। পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা। ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হল। দক্ষিণমার্গী বাম (তদানীন্তন সরকারের অংশভাক) প্রবল ভাবে রুশ অনুগত, বাম মার্গী বাম (সরকারের তীব্র বিরোধী অথচ সংবিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী নয়) রুশ-চিনে বিশ্বস্ত। আস্বস্ত কিনা জানিনা। তৃতীয় কমিউনিস্ট পর্যায়টি অতিবাম। সংবিধানবিরোধী। সশস্ত্র বিপ্লবের অনুগামী। চিনানুগামী। মৃণাল সেনের অনুগামীতা নিজস্ব মেধা, মনন ও প্রয়োগের অনুমত। নকশাল আন্দোলনের প্রতি অনেকাংশে মমত্ববোধক। সিদ্ধার্থ অনুগত একেবারেই নন। অনেকাংশে বুদ্ধ অনুগত। সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধত্বে যাওয়ার পথে মধ্যে আছে বোধিলাভ। মানু-সংহিতায় এসে গেল ইমারজেন্সি। মৃণাল সেন দেখেছেন অনেকটাই। মাউন্টবেটেন থেকে মমতা অনেকটাই দেখেছেন।

এত বড় আন্তর্জাতিক মানের পরিচালক যখন উপেক্ষিত যদি ছবি করার অবস্থায় থাকতেন হয়ত এমন কিছু নির্মাণ করে যেতেন শিল্প-মানবিক দায়বদ্ধতার চরম উদাহরণ হয়ে থাকতে পারত। শুধু তিনি কেন, মানিকবাবু যদি সন্দেশখালি দেখতেন শুধু। 'সন্দেশ' নিয়ে থাকতে পারতেন কি। ছবির শেষে প্রতিবেশীর মত বৃদ্ধ অসহায় পিতা সন্তানকে বলেন, একটু আগে এলি না বাবা গেলে মাকে দেখতে পেতে। কিন্তু অপেক্ষা করার সময় সুযোগ কিছুই নেই। আবার পথে নামতে হবে। মুখাগ্নি ইত্যাকার কৃত্য কনিষ্ঠর হাতে সঁপে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের হয়ে আবার পদাতিক পথে নেমে আসে।

ডিটেলসের ক্ষেত্রে মৃণাল সেনকে খুব সতর্ক মনে হয় বাইশে শ্রাবণ ছবিতে। দারিদ্র্যের ডিটেলস বৈভবের ডিটেইলসকে অনেক ছাড়িয়ে যায়। যে গুলি দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে এনেছেন ঋত্বিক ঘটক। ২২ শে শ্রাবণ বাঙালির জীবনে চরমতম বিপর্যয়ের সময়। চিদানন্দ দাশগুপ্তের লেট থার্টিসের মহাকাব্যিক রূপান্তর। রেলগাড়ির ভিতরের দৃশ্য। হকারদের চিৎকার। গলার জোরে বিপণনের বাজার ধরা। মিড শট। মানুষের মেলা। আবার একটা চরকের মেলা। অসংখ্য মানুষ মিলে যাচ্ছে। একা থাকতে চাইছে না। লঙ শটে ধরা পড়ছে হাজার মানুষের হাজার অভিরুচি। মাধবীর ছবি তোলানোর ভারি ইচ্ছে রাজেনের। কিন্তু ফটোগ্রাফার যখন ফ্রেম ঠিক করার জন্য মাধবীর চিবুকে হাত দেয় নায়কের চোখে তখন বিশ্বসংসারের বিরক্তি। চিরন্তন পুরুষের ঈর্ষা। রিপু করা জীবনে ষড়-রিপুর আনাগোনা। ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ঘর গড়া। আবার ঘর ভাঙ্গা। একটু একটু করে ঘর যখন ভেঙে যায় মানুষ দূরে দূরে সরে যায়। দূরের মানুষ যত কাছে আসে কাছের মানুষ তত দূরে যায়। তারপর সব দূর যখন বিশ্বাসে অবিশ্বাসে টলমল করতে করতে নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন দেখে দোলনা ঝোলানো হুক থেকে ছায়ার বৃত্ত আঁকতে আঁকতে সংসারটি কখন টলে গেছে। সম্পর্কের ঠাস বুনোট কখন যেন আলগা হতে থাকে। মৃণালের ছবিতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এই কালের দোলা কালোর দোলা হয়ে যায়। শুধু ক্যামেরা ধরে রাখে ঘরভর্তি শূন্যতা। কিছুদিন আগেও ছিল শূন্যতার মধ্যেও বিশ্বাসভর্তি ঘর। এ ঘর কি হাসন রাজার? যা শূন্যের উপর ভালোবাসা দিয়ে বেঁধে দেন লালন ফকির? আট কুঠুরি নয় দরজায়? এই ছবিতেও মন্তাজের নিপুণ ব্যবহার। মাধবীর নানা ভাবের, রূপের ও রূপান্তরের, বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের, প্রেম ও প্রতিবাদের ছবি নিয়ে নিরুপম মন্তাজ। এই বিনির্মাণে মৃণাল সেন কালীঘাটের পটুয়ার মত রঙিন জাদুকর।

মৃণাল সেন রঙের জাদুকর। ১৯৮০ সালে নির্মাণ করলেন আকালের সন্ধানে। আরো বেশ কয়েকটি ছবির মত জাতীয় বাজার ধরার জন্য এখানে নিয়ে এলেন স্মিতা পাতিলকে। স্টার কাস্টে একদল ঝকঝকে অভিনেতা। এই ঝকমকে মানুষেরা যাচ্ছে আকালের ছবি তুলতে। দুপাশের সবুজ ধান্যভূমির মাঝখান দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। বাস যখন গ্রামের দিকে যাচ্ছে তখন সমবেত গণসংগীত ভেসে, হেই সামালো ধান হো কাস্তেটা দাও শান হো জান কবুল আর মান কবুল আর দেবো না আর দেবো না রক্তে বোনা ধান। দুপাশে আদিগন্ত সবুজ ধানের জমি দৃষ্টিনন্দন হলেও কোথায় একটা ধাক্কা দিয়েছে। সবুজ ধানের ক্ষেত আকালের দ্যোতক হতে পারে না। অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পে বাঁক মোড়গুলি যথেষ্ট নাটকীয়। নাগরিক মানুষেরা আকাল খুঁজতে গেছে গ্রামে। কয়েকটি গাছ মাটি ক্ষয়ে গিয়ে শুধু শেকড় বাকড়ের সংসার নিয়ে ঝুলে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র অগুন্তি শেকড়। রুটস। এলিয়টের মতো কবি থেকে গান্ধির মত নেতারা সর্বদাই বলতেন, গো টু দা রুটস। শেকড়ে যাও। শেকড়গুলি ধরে ঝুলে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। শুটিং থেকে নতুন শব্দ আহরণ করল ছেলে বুড়োর দল। কাট্। তারা কাট কাট বলতে বলতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

এইসব যন্ত্রপাতি এসব অচেনা শব্দ জেনারেটরের ঘটর ঘটর আওয়াজ নাগরিক আলো জ্বলে ওঠা গ্রাম সব মিলিয়ে বিপন্ন বিষয়। আরও নতুন শব্দ শিখছে গ্রাম-প্যাক আপ। শুটিং পার্টির জন্য জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আকালের ছবি তুলতে গিয়ে আকাল নেমে আসছে হাটে বাজারে। আর বাড়ছে সন্দেহ। দুর্গাকে (শ্রীলা মজুমদার) তার স্বামী (নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত) গাঢ় সন্দেহে জিজ্ঞেস করছে, চাল কোথা পেলি? চালের এই আকুতি কি অশনি সংকেতের মন্বন্তরের প্রতিরূপ? কোনটা ছবির সত্যি কোনটা বাস্তবের সত্যি দুইএর সামঞ্জস্যের বুনানি চলেছে প্রতিটি শটে। এই ছবির সংলাপ স্বতঃস্ফূর্ত। মৃণালের মুখপাত্র হয়ে ধৃতিমান বলছেন, ডায়লগ নেই। স্পটে হয়ে যাবে। ইন্টারভিউ প্রসঙ্গে রঞ্জিৎ মল্লিক এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। যে বাড়িতে শুটিংয়ের দল, নায়িকা পরিচালক আশ্রয় পেয়েছিল সে বাড়ির কর্তা প্রয়াত হলেন। সদ্য বিধবা গীতা সেন এখন একা। শূন্য খাট একা পড়ে আছে। দুর্গাও ভীষণ একা। একটা জলজ্যান্ত মানুষ ছোট হতে হতে কোন এক সময় কালোর বৃত্তে হারিয়ে গেল। মুছে গেল কালের বৃত্তে। আকালের সন্ধানে একমুখি ছবি। অথচ বহু মাত্রিক। সত্য কল্প কখন রূঢ় হয়ে ওঠে। সমষ্টির প্রত্যাশিত স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যায়। কখনো তাদের মনে হয়, দারিদ্র একটা বিপণন। একটা পণ্য। নগ্নতার মতই। মনে হতে পারে, পথের পাঁচালীর পর তৎকালীন সাংসদ (এবং অভিনেত্রী) নার্গিস দত্ত বলেছিলেন, সত্যজিৎ রায় ভারতের দারিদ্র দেখিয়ে পাশ্চাত্যে বিপণন করবেন।

যেমন করে কালীঘাটের পটচিত্র বিশ্ববাজারে বিপণন হয়।

কালীঘাটের প্রসঙ্গ যখন এল আমরা 'চালচিত্র' নিয়ে খন্ডকালীন আলোচনা করতে পারি। ১৯৮১ র ছবি। ইংরেজি অনুবাদে বলা হচ্ছে ক্যালাইডোস্কোপ। চালচিত্র কিন্তু ক্যালাইডোস্কোপ নয়। এর মধ্যেকার কাচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছবি নির্মাণ বিনির্মাণ করা যায়। মুভমেন্টের সঙ্গে আবহমান। চালচিত্র মূলত মূর্তির প্রেক্ষাপট। ভালো বলতে পারবেন পিংলার পটুয়ারা। এখনো যারা লতাগুল্মের রঙ ছেনে এনে ছবি আঁকেন। ছবির প্রথমেই শোলা-রাঙতার মুকুট পরিহিতা দুর্গার মুখ দেখিয়ে অভিমুখ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন পরিচালক। এই ছবির ট্যাগ লাইন হতে পারতো, খাচ্ছে খাচ্ছে লোককে খাওয়াতে হবে। নিজেকে বেচতে হবে। আমরা সবাই সেলসম্যান।' যতখানি পান ততোধিক স্যাটায়ার। যতটা উইট ততোধিক হিউমার। কেনাবেচার খবর আমাদের উৎপল দত্ত আগেই শুনিয়েছেন জনঅরণ্য ছবিতে। ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট। তখন ছিল বড়বাজার। এখন আনন্দবাজার (?)। হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নইলে প্রফুল্ল সরকার এন্ড কোং। এভরিথিং ইজ এ কমোডিটি। পণ্যায়নের যুগ। যে কমোডিটি যত বিক্রীত হতে পারে সে তত কম বিকৃত হবে। একদিকে বিশাল বড় ছাপাখানা। টাইপ রাইটারের ঐকতান শোনা যাচ্ছে- কটা কট কটা কট। বড় একখানা হাইডেলবার্গ মেশিনে ঢেউএর পর ঢেউএর মত নেমে আসছে অক্ষর মালা। কত ভাঙা গড়ার গল্প। খবরের কাছে সবচেয়ে বড় ট্রেডমার্ক দারিদ্র বিপর্যয় সংকট। উৎপল দত্তের টেবিলে রাখা আছে একটি বই। পসিবল ড্রিম। এই ছবির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে কনট্রাস্ট। অত বড় ছাপাখানা। অজস্র লোকজন কর্মরত। তারা কিন্তু কাজ করছে যন্ত্রের মত। খানিকটা মডার্ন টাইমসের মত। আর পাশাপাশি উচ্চাকাঙ্খী যুবকটির (অঞ্জন দত্ত) বাসভূমি। ফ্লাট বাড়িতে এগারোটা পরিবার বসবাস করে। উঠোন একটি। যেখানে গীতা দত্ত আছাড় খেয়ে পড়েন। কোন একটি পরিবারের কাজের মেয়ে ভাতের ফ্যান ফেলে দিয়েছিল। প্রথমেই দ্বন্দ্বের কারণ সুক্ষাতিসুক্ষ্ম। কার ফ্যান কে ফেলেছিল। এক একবার মনে হচ্ছে এগারোটি পরিবার যেখানে বাস করে সেখানে এগারোটি কয়লার উনুন জ্বলে। এমন ভাবে ধোঁয়া বের হয় যেন বাড়িটা একটি

ছোটখাটো ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরি। মানুষগুলির ছাদ আছে। ঈর্ষা আছে হিংসা আছে মমত্ববোধ আছে। একসঙ্গে ঘর বেঁধেছে। একসঙ্গে মত বাঁধতে পারেনি। তারা বহু হয়েও একক। অপরের মুখ ম্লান দেখলে তাদের প্রিয় সাধ স্বাদু হয়ে যায়। এই বহুধাগামী মতবাদের ভাড়া বাড়ির উল্টো দিক হচ্ছে পাবলিকেশন অফিস। যেখানে খুব হাল্কা চালে উৎপল দত্ত বলেন, পৃথিবীটা বেচাকেনার হাট। অঞ্জন সুন্দর একটা পরামর্শ দেন, কলকাতার উনুনগুলির উপর একটা কিছু আর্টিকেল লেখা যায়। মালিক 'খাবার' হওয়ার মতো প্লটটিকে সাজিয়ে দেন। দুটোর কেন্দ্র বিন্দুতে উনুন এবং ধোঁয়া। অন্ন এবং দূষণ। যেহেতু মালিকের সঙ্গে মেলেনা, অতএব প্রস্তাবক কমিউনিস্ট। সাত- আটের দশকে এই ছাপ দিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা ছিল উচ্চবিত্ত কলকাতার সহজাত প্রবৃত্তি। গিভ এ ব্যাড নেম বিফোর কিলিং এ ডগ। প্রোটাগনিস্ট ঘুমের মধ্যে শুনতে পায় মার্চিং স্টেপ। জনযুদ্ধের পদক্ষেপ। যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ১১ পরিবারের ছাদ বেয়ে ধোঁয়া উঠছে। কলকাতা শহর থেকে যাচ্ছে ধোঁয়ায়। ঘন্টা বাজিয়ে দমকল এসেছে। তারা একটানা চেস্টা করে ধোঁয়া এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। অবশেষে আপোষ। পাপোশ হয়ে যাওয়ার চাকরি গ্রহণ করে অঞ্জন। বাড়িতে আসে পরের প্রজন্মের প্রয়োজনীয় পণ্য। গ্যাস সিলিন্ডার। ১১ জোড়া চোখ ঈর্ষা আর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ঈর্ষা আগুন থাকলেও যেদিকে ধোঁয়া বেরচ্ছিল সেই নির্গমনের পথ বেয়ে ধোঁয়া ভিতরে ঢুকে যেতে থাকে। কোন বিস্ফোরণ হয় না। ডিক্লাসমেন্টের কথা ছিল সে মাস্ ছেড়ে এখন ক্লাস হয়ে যাচ্ছে। ছবিটিতে এমন ভাবে দুটি রং ব্যবহার করা হয়েছে যাতে অন্তর আর বাহির অনুপম হয়ে উঠতে পারে। বহুবার সিপিয়া মাঝে মাঝে এ্যাম্বার। মৃণাল সেনকে রঙের মাস্টার বলে অভিহিত করা যায়। যখন সাদাকালো ছবি করেছেন, কন্ট্রাস্ট এমন জায়গাতে রেখেছেন যাতে দর্শক আলোকে আয়ত্ত করতে পারে। যখন রঙ নিয়ে খেলা করছেন তখন তিনি জাদুকর। ধুলোয় ঢাকা কলকাতার রং, ধোঁয়ায় ঢাকা কলকাতা, ভোরের কলকাতা, সন্ধ্যের কলকাতা প্রতিটি মুহূর্তে কলকাতার রঙ বদলে বদলে যায়। বদলায় না মূল চরিত্রের অনুভূতির আর পোশাকের রঙ।

এই পর্বে আরেকটি ছবি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। মৃণাল সেনের প্রতিটি ছবির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মুন্সিয়ানা সম্যক দেখা যায়। চালচিত্র থেকে অনেক এগিয়ে আসি। ১৯৯৩ এ নির্মিত ছবি অন্তরীন। ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রযোজনা। সাদাত হোসেন মান্টোর মূল কাহিনির উপর ভিত্তি করে নির্মাণ। মৃণাল সেনের অনেক ছবিতেই সত্যজিতের অনুষঙ্গ নানাভাবে এসেছে। এখানে আমরা প্রেক্ষাপটে ছোঁয়া পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের গল্প ও তপন সিংহের পরিচালনায় ক্ষুধিত পাষাণের অনুকল্প। ছবির গল্প তেমন বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন থেকে সরে আসছি। দুজন মুখ্য চরিত্র। অঞ্জন দত্ত এবং ডিম্পল কাপাডিয়া। দুজন একা মানুষ। একজন বন্ধুর বাড়িতে একাকিত্বের মধ্যে বন্দী। নারীচরিত্র একা। মেয়েটি আধুনিকা এবং ধনী। বাস করেন হাল ফ্যাসানের বড় বাড়িতে। বাড়ির চারিদিক সাদা। টেলিফোনটি লাল। পুরুষটি একটি বড় বাড়িতে আছেন। চারিদিকে আভিজাত্য ও ভেঙে পড়া বনেদিয়ানার চিহ্ন। টেলিফোনটি সেকেলে এবং কালো। আমাদের খন্ডহর মনে পড়ায়। দুটো বাড়ির কনট্রাস্ট চমৎকারভাবে বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরছে ক্যামেরা। ক্যামেরার নিপুন ব্যবহারের পাশাপাশি অসামান্য ব্যবহার আলো-আঁধারির। এখানে কেউ ভাবতে পারেন অনেক গিমিক ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে রঙের ইমেজ বাস্তবতা নৈঃশব্দের মধ্যে আলো-আঁধারি খেলা দিবারাত্রির মধ্যে সরব পটপরিবর্তন এনে দিচ্ছে। কালো অন্ধকার কেটে হঠাৎ লাল পর্দার মতো অবশিষ্ট আলো নীরবতার মধ্যে হঠাৎ প্রকট। টেলিফোনে পুরুষ যখন বলে, আমি এ বাড়িতে সম্পূর্ণ একা। ঠিক তখনই একটি ইঁদুর পায়ের নিচে দিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ একা নয়।

অন্যপ্রান্তে আসে বিড়ালের কণ্ঠস্বর। আর একটা প্রাণী আরেকটা প্রাণ। যেখানে খাদ্য খাদক সম্পর্ক ইঁদুরের সঙ্গে। সময় দেখতে গেলে দেখা যায় ঘড়ি বন্ধ। কোন অনন্তকাল থেকে। সময় হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। শান্ত পুকুরে ঢিল পড়ার আলোড়নের মত দু প্রান্তে জেগে আছে দুটি টেলিফোনের তার বেয়ে এলিয়েনেশন। যেন ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সালিট্যুড। কেউ কাউকে চেনে না। কেউ কারো নাম জানেনা। ঠিকানা জানে না। মাঝে মাঝে পুঁতির মালা সেলাই করার মত কল্প-গল্প সেলাই করা হয়। প্রথম দিকে দেখা যায়নি পরে দেখা গেল পুরুষটির কোনাকুনি পিছনে একটি ভাস্কর্য। ভেনাসের জন্ম। নগ্নিকা। শুধু কারুকৃতি নয়। বাসনারও জন্ম হয় বুদবুদের মত। প্রচুর ইমেজ। প্রচুর ডিটেইলস। আলো-আঁধারির ব্যবহার। প্রতিটি মুহূর্ত নীরবতার প্রাণসম্পদে পরিপূর্ণ। দুজনের নির্জনতা জনতা থেকে অনেক দূরে। জীবনানন্দের কবিতার শিশিরের শব্দের মত।

তাদের আর কোন দিন দেখা হয় না। আমরা দুজনকে দেখি। ক্যামেরা আমাদের চিনিয়ে দেয়। একজন ট্রেনে থেকে যায়। অন্যজন প্লাটফর্মে নেমে হেঁটে যায়। যখন অন্ধকার ছিল টেলিফোনের দুপ্রান্তে দুজনকে আপাত চিনত। এখানে আলো প্রতুল। শব্দ প্রচুর। নির্জনতার জায়গায় জনতার ব্যস্ততা। দরজা আটকানোর জন্য তিরস্কার। তবু চেনা যায় না। চেনা অচেনার এই দোলাচলটি মৃণাল সেনের নিজস্ব বনিয়াদ।

আরও অন্যান্য ছবি নিয়ে কিছু আলোচনার অবকাশ রইল। এ লেখা লিটারারি ক্রিটিসিজিম নয়। স্রেফ একজন আম্ পাঠকের (পড়ুন দর্শকের) আত্মগত অনুভূতি। পাঠান্তরে বিশদে যাওয়া যেতে পারে।

ঘ. মৃণাল সেন ও আর দুজন: নাগরিক ধারাপাত

আমার নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী সত্যজিত রায়- ট্রিলজির তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে বিভূতিভূষণ-পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও অপুর সংসার। দ্বিতীয় পর্বে কলকাতা মহানগর। জন অরণ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী ও সীমাবদ্ধ। তৃতীয় পর্বে গান-ময় ফ্যান্টাসি আর কমিটমেন্ট। গুপি গাইন বাঘা বাইন, হীরক রাজার দেশে এবং গুপিবাঘা ফিরে এলো (পিতাপুত্র জয়েন্ট ভেঞ্চার)। ঋত্বিকের ট্রিলজির উৎসমুখ দেশ ভাগ। সুবর্ণরেখা, মেঘে ঢাকা তারা ও কোমল গান্ধার। ছিন্নমূলের দগদগে ঘা থেকে তখনও রক্ত পুঁজ বেরিয়ে আসছে। ভয়ংকর সুন্দর নিয়ে কখনো আসছেন জীবনানন্দ। কখনো বোদলেয়ার। লেয়ার বদলে যাচ্ছে। মৃণালের ট্রিলজিতে নগর এসেছে 'নবান্নে'র হাত ধরে। (বিজন ভট্টাচার্য শম্ভু মিত্রের নবান্ন। গঙ্গা তীরবর্তী ভবনের কথা বলছি না)। এসেছে আইপিটিএ আন্দোলনের তটরেখা ধরে। কখনো কখনো এলিয়েনেশনের হাত ধরে। মৃণাল সেনের ছবিতে নাগরিক 'আমি' আছে। এই আমি সমন্বিত হয়ে, বহু হয়ে 'আমরা' হয়ে যাচ্ছে না। অনেকগুলো 'আমি'ই থেকে যাচ্ছে। এসব 'আমি'দের গঙ্গা-বাঁকের উপকথা। সেখানে কোট-পেনটুল পরা বেনেয়োরি আছে, চাকরির জন্য হাঁসুলি বাঁক কেটে আবাদ বানাতে আগ্রহী করালী আছে। এইসব আমি' দের নিয়ে সাতের দশকের ট্রিলজি বা নাগরিক ট্রিলজি ইন্টারভিউ (১৯৭১), কলকাতা ৭১, (১৯৭২) ও পদাতিক (১৯৭৩)। কোরাস (১৯৭৪) (একটি আধুনিক ফান্টাসি) ট্রিলজির মধ্যে ধরা না হলেও আলোচিত সিরিজের ধারাবাহিকতার অনুবর্তি ভাবা যেতেই পারে। ঘিয়েটারে তখন ব্রেক্ষটিয় প্রভাব। ডিটাচমেন্ট থিওরি। সবটুকু বলা হয় না। অনুমান করতে হয়। উপলব্ধি করতে হয়। মন্তাজের ব্যবহার, টুকরো টুকরো ইমেজের ব্যবহার, সত্য ও সত্যকল্পের দ্বন্দ্ব, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার দ্বিধা। সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে রিয়েলিজিম এবং সুর- রিয়েলিজিম। সত্যজিতের নাগরিক ট্রিলজির প্রথমটি প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০)। কাহিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ভালো গল্পের জন্য সত্যজিৎ রায় সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। প্রধান অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের হাঁটা

চলা শব্দ প্রক্ষেপণ সব মিলিয়ে সমকালীন কলকাতার জীবিকার অন্বেষণে তাড়া খাওয়া সময়ের প্রতিনিধি। ১৯৭৩ এ মৃণাল সেনের পদাতিক ছবিরও মূল চরিত্র ধৃতিমান। পরিপ্রেক্ষিত অনেকাংশে এক কিন্তু অন্দর ও বাহির যাপনে স্বতন্ত্র। ছবির কাহিনিকার আশিস বর্মন এবং মৃণাল সেন। নির্মিতির ক্ষেত্রে মৃণাল সেন বিপুল ভাবে স্বাধীন। ছকে বাঁধা বিন্যাসে তাঁর খুব একটা আস্থা নেই। বিনির্মানে বিপুলভাবে যথেচ্ছগামী। কলকাতা ট্রিলজির সবকটি কাহিনি নির্মাণে মৃণাল সেন বিপুলভাবে আছেন। দেখার বিষয়, পরিচালকের নিজস্ব মার্কসীয় ধারণা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নানা অংশে, বিশেষত পূর্ব ইউরোপে, কমিউনিস্ট সরকারের গঠন ছবিগুলিতে কোনো না কোনোভাবে এসেছে। অন্যদিকে ভারতের একদিকে শ্রীমতি গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রণা আর অন্যদিকে নকশাল আন্দোলনের বিকাশ, শান্তিরক্ষার নামে নকশাল হত্যা। কাশিপুর বরানগরে হত্যাযজ্ঞ। মানিক থেকে মহাশ্বেতা হয়ে সন্দীপনের গল্প-উপন্যাসের তীব্র কমিটমেন্ট। উৎপল-অজিতেশের নাটক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিকোণ থেকে নবারুন ভট্টাচার্যের এই মৃত্যু উপত্যকা, সব মিলিয়ে আগুনের পাঠশালা গ্রামনগর। এই অস্থিরতা মৃণাল সেনের ক্যামেরায় (ক্যামেরা চালাতেন কে কে মহাজন। সত্যজিতের ক্ষেত্রে সৌমেন্দু রায়) দুর্দমনীয়ভাবে ধরা পড়েছে। মৃণাল সেনের ক্যামেরা একটি যন্ত্র নয়। স্বয়ং একটি চরিত্র। শট ব্যবহারে তিনি যথেচ্ছগামী। সত্যজিতের ট্রিলজির দ্বিতীয় ছবি (সীমাবদ্ধ) ও তৃতীয় ছবি (জন অরণ্য)র কাহিনিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলকাতা-বিদ লেখক শংকর। এক কথায় বলা যায়, শঙ্করের কলকাতা আর আশীষ বর্মনের কলকাতা সম্পূর্ণ আলাদা। বিমল মিত্রের পর শঙ্করের কলকাতায় অবশিষ্ট বনেদিওয়ানা ও ক্ষীয়মান ঐতিহ্য রক্ষার দায় থেকে নতুন লেখকেরা বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। যুক্তিতক্কোগপ্পে ঋত্বিক ঘটক তো সরাসরি 'বিবর, প্রজাপতির' লেখক সমরেশ বসুকে আক্রমণ করছেন। ভাষা একেবারে চাঁচাছোলা। মৃণালের ভাষা ক্যামেরা। সত্যজিতের ভাষা শালীন ও সংযত। কলকাতা ৭১-এর কাহিনিকার চারজন- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, প্রবোধ সান্যাল ও মৃণাল সেন। চরিত্রে ব্যবহার করেছিলেন সেকালের সমান্তরাল ছবির সব কজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে (এক্টর অর্থে)। মাধবী মুখোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, উৎপল দত্ত, রঞ্জিত মল্লিক প্রমুখ। ইন্টারভিউতেও করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝেমধ্যেই তিনি পথের পাঁচালীর সর্বজয়া হয়ে ওঠেন। চরিত্র বিনির্মাণের এই ব্রেক্ষটিয় তত্ত্ব মৃণাল যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি টেকনিক্যালি ভীষণ শক্তিশালী। অনেকে বলে থাকেন কোলাজ মন্তাজ এবং ক্যামেরার ব্যবহারে তিনি প্রচুর গিমিক ব্যবহার করেছেন। এই সত্যাসত্যের ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভালো।

সমকালীন তিনজন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতার মধ্যে মৃণাল সেন সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন। তিনি পরাধীন ভারত দেখেছেন। দেশভাগের যন্ত্রণা জানেন। অন্তত বাসা না পাওয়ার সমস্যা থেকে। নেহেরুর পঞ্চশীল থেকে ইন্দিরা গান্ধীর ইমারজেন্সি হয়ে মোদি-কাল দেখেছেন। বিধান রায় থেকে বাম জমানা হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'চলচ্চিত্র উৎসব' দেখেছেন। নির্মতি থেকে সরে এসেছেন। অপেক্ষা করেছেন। উপেক্ষা পেয়েছেন।

তবু শতবর্ষে উপেক্ষার পূতি-লগ্নে আমাদের মত আত্মঘাতী বাঙালি জাতিকে স্বীকার করতেই হবে বাংলা চলচ্চিত্রের সাবালকত্বে তিনি একজন অপরিহার্য সেনাপতি।

পদাতিক : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও সিমি গারেওয়াল

অসাধারণকে বোঝার সাধারণ প্রয়াস

তমালী নিয়োগী

চলচ্চিত্র গবেষণার সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয় এমন একজন মানুষ আমি। যখন বিশ্ববন্দিত চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন নিয়ে কিছু লেখার অনুরোধ এল, যখন ভাবতে শুরু করলাম মানুষটিকে নিয়ে, তার কাজ নিয়ে, তখন বরং বলা ভালো আরও একবার, সর্বপ্রথম চোখ থেকে খসে পড়ল নিজের অজ্ঞাতেই পড়ে থাকা এক রঙীন চশমা, উন্মোচিত হল নিষ্ঠুর বাস্তবতার এক সাদা কালো পৃথিবী, যে পৃথিবী সক্ষম এক চকচকে আস্তরণের তলায় তার সমস্ত ক্রুরতা লুকিয়ে রাখতে, যে পৃথিবী বহুগুণ পৃথক ষাট, সত্তর কিমবা আশির দশকের অস্থির বাস্তবতায় পরিপূর্ণ সেই পৃথিবী হতে যা পরতে পরতে সত্যের সংগোপনে তবুও অনেক পিছিয়ে সমসাময়িক যুগ হতে। আর পূর্ববর্তী যুগের এই অস্থির, অশান্ত সময়ের সত্যকেই নির্ভেজাল ভাবে, নিয়ম ভাঙ্গার অনুশাসনে ফ্রেমবন্দী করেছেন মৃণাল সেনের মত চিত্রপরিচালক।

দৃশ্যপটে ভেসে উঠছে নব্বই এর দশকের এক কিশোরী যে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে ছোট্ট, বিবর্ণ টেলিভিশনের সরকারী চ্যানেলের দ্বারগ্রস্থ হত। চূড়ান্তভাবে অর্ন্তমুখী এবং সমাজসচেতনতার সিকিভাগ না থাকা, মধ্যবিত্ত পরিবারের এই কন্যা মেঝেতে বসে একমনে পর্দার দিকে চেয়ে

থাকত। সবটা বোধগম্য হত কি সেই বয়সে? কোন মতে খেয়ে পড়ে বেড়ে ওঠা মেয়েটির জানা ছিল না কে মৃণাল সেন। মনে পড়ে না চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে এই নামই ভেসে উঠত কিনা টেলিভিশনের পর্দায়। তবু আজ একটু ভাবতে বসে স্মৃতির দুপাতা ওল্টাতেই মনে পড়ে গেল কিছু দৃশ্য– চলচ্চিত্রের শেষভাগে এক বৃত্তের মধ্যে ধরা পড়ে নায়ক, কথোপকথনে পরিচালক বা দর্শকের সঙ্গে কিমবা শো-রুমের বাইরে থাকা স্যুট পড়া ম্যানিকিনের দিকে তার কাল্পনিক পাথর ছুঁড়ে দেওয়া; অন্ধকারে ভেসে ওঠা নিহত যুবকের মুখ, দর্শকের দিকে চেয়ে যে বলতে থাকে সে মৃত, তাকে হত্যা করা হয়েছে; ছবির শুরুতে খবরের কাগজ বিক্রেতার তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে আসা, আসছে খবর আর তার পরেই আত্মহত্যার আবিষ্কার। হ্যাঁ, আজ জানি, এই সকল দৃশ্যই তাঁর নির্মিত, মৃণাল সেন, সিনেমা যার কাছে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তের বাস্তবকে তুলে ধরা নয়; কল্পনা এবং বাস্তবের সীমারেখা যেখানে বিলীন হয়ে যায়, সেই সিনেমাই বাস্তব। তিনি হলেন সেই সাহসী স্রষ্টা যিনি প্রথম হতে শেষতম কাজ পর্যন্ত প্রতিটিতে বিনোদনের থেকেও অনেক অনেক বেশিগুন সিনেমা মাধ্যমকে প্রাধান্য দিয়েছেন বাস্তবের প্রতিচ্ছবি করে তুলতে। আর এই কারণ হেতু হেলায় বিসর্জন দিয়েছেন জনপ্রিয়তা অর্জনের স্বাভাবিক কাঙ্খাকেও। তাই তাঁর কাজের প্রাসঙ্গিকতা আজও অমলিন। যদি ধরি ''ভুবন সোম''-এর কথা তবে মনে পড়বে এখানে স্কিনে ভেসে উঠছে রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ, পন্ডিত রবিশঙ্করের প্রতিচ্ছবি আর একটি কণ্ঠস্বর জয়গান গাইছে সোনার বাংলার, মহান বাংলার, বিচিত্র বাংলার। আজও কি আমরা বাঙালিরা কণামাত্র বদলেছি? অতীতের অমৃতকে আঁকড়ে ধরে বর্তমানের বিষকে চাপা দেবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত এক আহত সভ্যতার অংশীদার আমরা। হ্যাঁ, ভি.এস.নাইপল্-এর মতে এই আমাদের "Wounded Civilization"। আপন সময়কে ফ্রেমবন্দী করতে চাওয়া মৃণাল সেনের কাছে সিনেমা ছিল এককথায় সমসাময়িক ঘটনাসমূহের মন্তাজ। তাঁর ওড়িয়া, হিন্দি, এবং তেলেগু চলচ্চিত্র গুলিও-এর ব্যতিক্রম নয়। বাস্তবকে এক সর্বাঙ্গীন প্রেক্ষাপটে ধরার মরিয়া চেষ্টা ফুটে উঠেছে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। কখনো বা তাঁর নিজের ভিতরের বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়াগুলি তাঁর এ কাজকে একই সঙ্গে আরও কঠিন করে তুলেছে। আবার সমৃদ্ধ করেছে। ''পদাতিক'' ছবিতে এক তরুণ পার্টিকর্মী প্রশ্ন তুলেছে অপরিবর্তনীয় মনোভাবাপন্ন পার্টির গোঁড়া হাইকম্যান্ডের কাজকর্ম ও আদর্শের যথার্থতা নিয়ে। ছবিই ছিল তাঁর কাছে 'থিসিস' এবং 'অ্যান্টিথিসিস'। এর মধ্য দিয়ে গিয়ে ''সিন্থেসিস'-কে ধরার চেষ্টা যা থেমে থাকতে পারতো শুধু একটি নক্সাল রাজনীতির ছবি হয়ে, মৃণাল সেনের ভিতরকার আলোড়ন, তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, তাঁর দূরদৃষ্টিতায় সেই ''পদাতিক'' ছবি হয়ে উঠল কালোত্তীর্ণ। ''মৃগয়া'', ''একদিন প্রতিদিন'', ''চালচিত্র'', ''খারিজ'' এ সকল চলচ্চিত্রই ব্যক্তি, সমাজ, সময়, যুগ এবং মহাকালকে বুঝতে চাওয়া এক শক্তিশালী শিল্পীর কালজয়ী সৃষ্টি।

জন্মশতবর্ষে বিদদ্ধ মানুষদের স্মৃতিচারণায় যে উঠে আসছে ব্যক্তি মৃণাল সেনের সেই সমস্ত দিক যা আজকের পৃথিবীর মানুষের কাছে বিশেষত: অবসাদগ্রস্থ যুবক যুবতীদের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয়—চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে, অনাহারে থেকেও হার না মানার গল্প, এক জীবন আলেখ্য যা বুঝিয়ে দেয় ছোট্ট ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে গড়ে ওঠা পৃথিবী তাঁর কাছে কখনোই আক্রমণ প্রতি আক্রমণের ভরা বাইরের সংঘাতময় পৃথিবীর ক্লেদ থেকে বাঁচতে চাওয়া ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছিল না বরং তা ছিল আরও একটি ক্ষেত্র—ক্ষুদ্র একটি কণা হিসাবে বর্হিজগৎকে আরও আপন করে নেবার। অর্থাৎ এখানেও মুছে যাচ্ছে আরও একটি সীমারেখা। সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠতে চাওয়া মানুষের নাম মৃণাল সেন। যাঁরা তাঁর কাছের মানুষ তাঁরা নিশ্চয় বলবেন আবেগের বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় না দেওয়া কিন্তু প্রাণের টানকে উপেক্ষা করতেও না পারা জীবনের অপর নাম মৃণাল সেন।

হ্যাঁ, অর্থলোভকেও অতিক্রম করতে পারা জীবনের শিল্পী মৃণাল সেন। আর তাই প্রশ্নই ওঠেনি বাণিজ্যিক ছবির আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পনের। জীবন যখন বিচ্ছিন্ন তথাপি সম্পর্কযুক্ত ঘটনা সমূহের কোলাজ মাত্র তখন চলচ্চিত্র কি করে হয়ে উঠতে পারে গল্প বলার মাধ্যম (যে গল্প বলার অক্ষমতার জন্য তাঁর বেশ কিছু ছবি স্বদেশে বহুল সমালোচিত)? আর সিনেমা যখন জীবনকেই তুলে ধরা এবং জীবনকেই বোঝার প্রয়াস তখন সেই সিনেমায় ব্যবহৃত টেক্‌নিক ও বাইরে থেকে আমদানি করা বা কোন আরোপিত কৌশল নয়। একটি প্রকৃত কবিতার কাঠামো যেমন গড়ে ওঠে কবিতার ভিতর থেকে, ঠিক তেমনই সিনেমার তত্ত্বকে গভীরে বোঝা মৃণাল সেনের তাবৎ টেক্‌নিক ও উঠে এসেছে সিনেমার ভিতর থেকে, বাস্তব থেকে আর তাই তা কখনো 'গিমিক' হয়ে থেমে থাকেনি। যেমন ''ইন্টারভিউ'' ছবিতে বার বার আলো পাখা বন্ধ হয়ে যাওয়া যেমন জীবনের প্রতিবন্ধকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে তেমনই তা তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের তীব্র বিদ্যুৎ সঙ্কটকে বিদ্ধ করছে। আরও একটি বিষয় ছিল মনে রাখার মত। তিনি এমন এক অনন্য সাধারণ চিত্র পরিচালক যিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হাতে কখনো তুলে দেননি স্ক্রিপট। কোন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই বরাবর হয়েছে ফ্রেমবন্দী। তিনি এমন এক চিত্র পরিচালক যে সিকোয়েন্স অনুসারে সাজানো গোটা সিনেমাই থাকতো সাজানো কোন খাতায় নয়, তাঁর মাথায়। আর না বললেই নয় যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন শিল্পীকে বহিরঙ্গে বিচার না করে তার শিল্পীসত্তাকে প্রাধান্য দেবার ক্ষেত্রে তার কথা। আবিষ্কার করেছেন বহু প্রথিতযশা শিল্পীকে, আরও বহু দিকের মধ্যে যে মহৎগুণ ফুটে উঠেছে এ যুগের প্রতিভাময় ব্যক্তিত্ব অঞ্জন দত্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য ''চালচিত্র এখন'' ছবির ফ্রেমে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য সাহিত্য নির্ভর ছবি করতে না চাইলেও সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে তাঁর কাজের উপর। যেমন বলা যেতে পারে তাঁর চলচ্চিত্রে ''মেটাফিকশন'' ধরনের আত্মসচেতনতার কথা (তাঁর ''আকালের সন্ধানে'' এমন একটি চলচ্চিত্র যা ছবি নির্মাণ এবং বাস্তবের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সিনেমার সীমাবদ্ধতার কথা বলে) বা ''ইন্টার টেক্সট্যুয়ালিটি'' -র আঙ্গিকে উদ্ধৃতির কথা। তাঁর টেক্‌নিক-এর প্রয়োগে কখনো কখনো সিনেমা হয়ে ওঠে থিয়েটার আবার কখনো বা গল্প থেকে শুরু করে তা যাত্রা করে ডিসকোর্স-এর পথে। অর্থাৎ আবারও মুছে যায় বিবিধ সীমারেখা। আবার কখনো বা ম্লান হয়ে পড়ে ভৌগোলিক অঞ্চলভেদও; কলকাতা হয়ে ওঠে ভিয়েতনাম। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যেমন দেশকালের সীমানায় আবদ্ধ থাকে না, এই মার্ক্সবাদী চিত্রপরিচালকের কাছে সিনেমাও হল এমন এক জীবনমুখী মাধ্যম যা কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের বিশেষ অস্থির সময়ের উপস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, হয়ে উঠেছে সমস্যাকীর্ণ, ক্লেদাক্ত জীবনের আন্তর্জাতিক রূপ। এখানেই মৃণাল সেনের আন্তর্জাতিকতাবাদের সার্থকতা।

পরিশেষে বলি এই নীতিদীর্ঘ লেখাটি যেমন আমার মৃণাল সেনকে বোঝার প্রয়াস, ঠিক তেমনই হয়ত বা ''চালচিত্র এখন'' ছবিতে অঞ্জন ঐ মহৎ শিল্পীকে বোঝার শেষতম প্রয়াস করেছেন। তাই সঙ্গতকারণেই আমার কথা শেষ হতে চলেছে একটি কবিতার মধ্য দিয়ে যা উঠে এসেছিল ''চালচিত্র এখন''-এর প্রতিক্রয়া স্বরূপ, অর্থাৎ এক শিক্ষানবিশ-এর মৃণাল সেনকে বুঝতে চাওয়ার কাব্যিক রূপ-এর মধ্য দিয়ে।

Acceptance is the Final Word

Dear ones, browse and you will get three different genus
Those who concede and conciliate are of benign type,
And for certain, who don't, are the most rebellious ones.
Nothing special as those fantastic foreigners,
Who in compromise remain uncompromising.

Natural objects accept change as tree its barrenness.
Whom will you ask the address of Daylight drowned in the evil inspiring darkness ?
Who wants to harmonize, dear ?
Have you ever seen the Sun or Moon, sea or ocean to bend a little ?
The storm knows only to arbitrate.

Life is lived in mutual concesions but only for the powerless or the ordinary For
All want to rebel, It's our nature.
A prometheus or a Titan ? Peace is jeopardized everytime Daedalus soars high.
Talent is maddening but For the greatest artists acceptance is the final word.

They don't rebel alike As the grass, when morning dew wets it, or earth the flood.

Is Cloud ever able to diminish the moon's glory?
The greatest is like the fish that swims in muddy water though free from mud,
Though infinite times irritated, the rainbow doesn't forget to shine in hope.

Dear ones, Best of Luck.

হ্যাঁ শুভকামনা রইল। বাংলা তথা ভারতবর্ষে গড়ে উঠুক আরও বেশি সংবেদনশীল তথা ''সফিসটিকেটেড'' দর্শক যাঁরা আনন্দ উপভোগ করবেন ভাষা এবং চিত্রকল্পে প্রতীক, ফ্যান্টাসির জট ছাড়াতে যাতে নতুন শতাব্দীতে আর কোন মৃণাল সেনকে তাঁর চেতনা জাগানোর প্রয়াস নিয়ে বিদেশের ফেস্টিভালে ঘুরে বেড়াতে না হয়। যোগ্য মূল্যায়ন হোক মৃণাল সেন-এর।

স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ঃ মৃণাল সেন

সঙ্গীতা মজুমদার

এক একজন মানুষ থাকে যিনি নিজের প্রতি উদাসীন, নির্মোহ-নিরাসক্ত। কিন্তু তাঁর ভিতরে আছে অনবদ্য শিল্পীসত্তা। এমনই এক একাকী পথ চলা মানুষ মৃণাল সেন। বাংলা দেশের প্রকৃতির বুকে তাঁর জন্ম হলেও পল্লীবাংলার (তখনও দুই বাংলা এক ছিল) কচি সবুজ ঘাসের ঘ্রাণ অথবা নদী বাংলার মেঘনা পদ্মার উথালিপাথালি জল কিংবা কুসুম কোমল ফুলের সুগন্ধ তাঁর জীবনদৃষ্টিকে স্বপ্নময় আবেগে আচ্ছন্ন করে রাখেনি। ছিন্নমূল মানুষের দেশ ছাড়ার যন্ত্রণা কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে সীমান্ত কাহিনী অথবা সাধারণ মানুষের রক্তাক্ত পাঁজরের গোপন কান্না তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। দেখেছিলেন দরিদ্র মানুষের পরিশ্রম কেমনভাবে বিফল ও মূল্যহীন হয়ে রয়েছে। মৃণাল ছিলেন একক পথচারী। তাঁর জীবন দৃষ্টিতে যা সত্য বাস্তব, তাকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর শিল্পমাধ্যমে।

কোনো অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপস করতে চান নি, হাততালির কোনো তোয়াক্কাই করেন নি।

তাঁর শৈশব কেটেছে রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে। তিনি রাজনীতি সচেতন মানুষ হলেও কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতি ছিল না তাঁর পক্ষপাত। বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের কথা তিনি সারাজীবন ভেবেছিলেন। তাই তাঁর বিষয়ে এদের কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে। মৃণাল যেন খানিকটা জীবনপুরের একাকী পথিক। সারাদিন বিভিন্ন ধরনের বইয়ের পাতায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। কিছু খুঁজতেন। এই আত্মঅন্বেষণের মধ্যেই তাঁর নির্মাণশিল্পকে কিভাবে রূপ দেবেন তার পথ খুঁজেছেন।

মৃণালের সমসাময়িক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' তখন দেশ বিদেশে খ্যাতি ছড়াচ্ছে , ঋত্বিক ঘটক 'মেঘে ঢাকা তারা' 'অযান্ত্রিক' নিয়ে ভাবনায় নিমগ্ন। তপন সিনহা 'অতিথি' - 'কাবুলিওয়ালা' ছবি করছেন। শুধু বাংলাই নয়, হিন্দী সিনেমায় ও তখন প্রায় স্বর্ণযুগ। কে. আব্বাসের 'মুঘলেআজম্' বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমীন', রাজকাপুরের 'জাগতে রহো' 'শ্রী চারশো বিশ', ভি. শান্তারামের 'ঝনক্ ঝনক্ পায়েল বাজে' সিনেমাজগতে রীতিমত সাড়া ফেলেছিল। ভালো ভালো চলচ্চিত্র পরিচালক সিনেমাজগতে যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন সেই সময় 'রাত-ভোর' সিনেমা দিয়ে মৃণাল সেনের আত্মপ্রকাশ।

একজন মানুষ চলচ্চিত্রে সমীক্ষকের ভূমিকা নিয়েছেন। দু চোখে তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্র, মধ্যবিত্ত জীবনের প্রত্যেকটি স্তরেই তার দৃষ্টি। তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছেন দৈনন্দিনের জীবনচর্চা। তাঁর ছবি হাততালি পেল কিনা, কতটা পাবলিশিটি পেল তার তোয়াক্কা তিনি করেন নি। মৃণাল সেন নিজের ছবি সম্পর্কেই বলেছেন - ''আমার একটাও ছবি নেই যা নির্ভুল''। নিজের ব্যাপারে এতটাই অকপট - স্পষ্টবাদী। মৃণাল সেন কে মনে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর। মানিক কেমন অনায়াসে সরীসৃপ - কুষ্ঠরোগীর বৌ - প্রাগৈতিহাসিক লিখেছিলেন। ফুটিয়ে ছিলেন সমাজের অসহায়, পঙ্গু - বিকৃত জীবনের বাস্তব কঠিন সত্য। মৃণালের স্বতন্ত্র চিন্তাধারাতেও কোনো বাধা অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। মৃণাল কিন্তু শুধু নিজের মতোই ভাবছেন না - তিনি মানুষের কষ্ট - আর্তনাদ - সংগ্রামের যুদ্ধটা দেখছেন। প্রেরণা পাচ্ছেন।

'নীল আকাশের নীচে' একটি চমৎকার ছবি। একজন চীনা এই ছবিতে প্রধান চরিত্রের ভূমিকায়। এই পৃথিবীতে কত বৈচিত্র্য- মানুষের অন্তরেও কত রকমের গভীর ক্ষত যন্ত্রণা, ব্যর্থতা আছে এই বিরাট আকাশ তার সাক্ষী। 'বাইশে শ্রাবণ' একেবারেই অন্যধরণের ছবি। এই সব ছবি প্রেক্ষাগৃহে বহু দর্শক জোটাতে পারেনি হয়তো তবে যাঁরা শিল্প, সিনেমা বোঝেন, ছবি ভালবাসেন তাঁদের মধ্যে এই ছবিটি যথেষ্ট আলোচিত হয়েছিল। নারী - পুরুষের এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব - সংকট ও সম্পর্কের টানাপোড়েন। রাজনৈতিক আবহে নর-নারীর জীবনজিজ্ঞাসা এখানে অদ্ভুতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মৃণাল সেনের একেবারেই অন্য ধরণের অনবদ্য ছবি হলো ' ভুবন সোম'। এই ছবির প্রকরণ -স্টাইল - সিনেমা ফটোগ্রাফি– স্টীল ফটো- অভিনব। বনফুলের ভুবন সোম এক অদ্ভুত মানবিকতার আবেদনে ভরপুর গল্প। অসাধারণ ব্যঞ্জনায় এই ছবিটি শেষ হয়েছে। উৎপল দত্ত - সুহাসিনী মূলে- এই চরিত্র দুটির মুখে বিশেষ কোনো সংলাপ নেই। কেবল অভিব্যাক্তি। ভুবন সোম উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। পাখি শিকার তাঁর নেশা। তিনি শিকারের জন্য গ্রামে গেছেন। সেখানেই দেখা বনকিশোরী অবাঙ্গালী বিদিয়ার সঙ্গে। বিদিয়ার পশু পাখীর প্রতি দরদ দেখে ভুবন মুগ্ধ। তারই সাহায্যে ভুবন পাখি শিকারে সফল হল। ভুবন ও বিদিয়ার সখ্যতা এক অদ্ভুত মানবিক প্রেমে পরিণত হয়েছে। বিদিয়ার স্বামীর সব অপরাধ ভুবন ক্ষমা করে দিয়েছেন বিদিয়ার কথা ভেবেই। নিষ্পাপ চঞ্চল হাস্যমুখী কিশোরী বিদিয়ার সরল আচরণ ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ ভুবনসোম। একটি বেলার সঙ্গ নিয়ে বিদিয়া ভুবন

সোমের আজীবন শূণ্যতাবোধকে যেন ভরে দিয়েছিল। ''বন্দী পাখীটা ছটফট করছে তার কবলে'' - এই প্রতীকী রূপকের মধ্যে ভুবন সোমের অর্ন্তনিহিত মানবিক রূপ ধরা পড়েছে। শিকার ধরেও তিনি ছেড়ে দিলেন। একটা পবিত্র বিশ্বাস ও ভরসার ছবি 'ভুবন সোম'।

মৃণাল সেনের এক একটি ছবি এক এক ধরণের। বহু মাত্রিক ব্যাঞ্জনায় তিনি নানান বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মাধ্যমে ছবি তৈরী করার পরিকল্পনা করতেন। সব ছবির চিত্রনাট্য নিজে রচনা করেছেন। 'মৃগয়া' সিনেমাটি একেবারেই অন্যরকম ছবি। রং নেই - রূপ নেই সোজা সাপটা ছবি। সাঁওতাল কন্যা ও ব্যাধের জীবন। অশুভ শক্তিকে দমন এই ছবির মূল কথা। সাদা-কালো রং ব্যবহারে ও দৃশ্যপটে - মৃণাল সেনের শিল্প যে সবার থেকে একেবারেই আলাদা, স্বতন্ত্র অনন্য - সে কথাই প্রমাণ করে এ ছবি। মহানগরের অস্থিরতা - সংকট, বেকার চারিদিকে - নেই - নেই। এত হতাশা তিনি দেখেছেন। চারিদিকের অন্যায় - দুর্নীতি অত্যাচারের বেসামাল জঞ্জালের স্তুপ দেখে মৃণাল স্বস্তি পাননি। অসহায় হয়ে উঠেছে তাঁর মানবাত্মা।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা - জনগণকে খোঁচা দিয়ে সচেতন করা স্বভাব তাঁর নয়। তবে জনগণের অসহায় মুখ তাঁর মনে নিরন্তর চাপ দিয়ে গেছে। মহানগরকে কেন্দ্র করেই তিনটি ছবি তৈরী করলেন তিনি। 'ইন্টারভিউ' - 'কলকাতা ৭১' এবং 'পদাতিক'। কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ সেখানকার মানুষ যারা কোনো কিছুই করতে পারছে না পদে পদে পরাজিত হচ্ছে তাদের কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। শুধু একদিনই নয় প্রত্যেকটা দিনই দীনমজুর খেটে খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন। 'একদিন প্রতিদিন' - ছবিতে বাড়ির মেয়ে কাজের খোঁজে বেড়িয়েছে। প্রতিদিনের তিক্ততা - অভাব - অনটন কী করে বাঁচবে এখন এক অনিশ্চয়তায় সে ধুকছে। শোষিতদের বাঁচার অধিকার নেই যেন। গরীবদের এই দাসত্ব মোচনে কোনো প্রচেষ্টাই নেই। ''একটা মেয়ে রাতে না ফিরলে তাকে নিয়ে যত কানাঘুষো''। নিম্নবিত্ত জীবনের শিকড়গুলো কেমন ভাবে আলগা হয়ে যাচ্ছে - বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে সব স্বপ্ন, ভাললাগার কবর খোঁড়া হচ্ছে। শোষণ নির্ভর সমাজ কতটা প্রতিবাদ করতে পারবে - কারা বাঁচার লড়াই-এ জিতে যাবে - শিল্পী মৃণাল তা নিয়ে চিন্তিত নন - 'আকালের সন্ধানে' ছবিতে দুর্ভিক্ষ কেন হল, সেই জিজ্ঞাসায় ঘুরেছে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে 'আকালের সন্ধানে' চিত্রিত হয়েছে। নিরন্ন মানুষের চোখে জল - ভাত নেই - রুটি নেই - মাথার উপরে ছাদ নেই - পরনে লজ্জা ঢাকার বস্ত্র নেই - দুর্গার কান্না শুধু দুর্গারই নয় - শতশত দুর্গার জীবনের বেঁচে থাকার আশা ভরসার কোনো জায়গা নেই। মৃণাল জীবনের এই কর্কশ রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিকারের উপায় খুঁজতেই তিনি বিপ্লবের স্ফূলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন।

কোরাস চালচ্চিত্র, এমন বেশ কয়েকটা ছবিতে মহানগরের বুকে বয়ে যাওয়া ধনীর শোষণ ও নির্ধন মানুষের হাহাকারের ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন মৃণাল। সিনেমা জগতে কোন পুরস্কার পেলেন কিনা কোনো পত্রিকায় তার ইন্টারভিউ ছাপা হচ্ছে কিনা এই সব নিয়ে তিনি নিরুত্তর, নির্বিকার। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি কখনই এক চুলও সরেন নি। কোনো প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হন নি। যা ভেবেছেন স্বয়ং তা করে গেছেন। সর্বহারা মানুষের তিনি স্বজন-বন্ধু। তাদের প্রতিকার কি ভাবে করা যায় তিনি পথ হাতড়ে বেড়িয়েছেন।

সত্যজিৎ রায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিনেমা করার পরে যথেষ্ট প্রশংসিত হন। মৃণালসেনের 'ইন্টারভিউ' ছবিটিও দর্শকমহলে প্রশংসা পায়। চমৎকার ইন্টারভিউ দেওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত মেধাবী ছেলেটার চাকরী হয়নি, শুধুমাত্র চাকচিক্য বিলিতি পোশাকের অভাবে। যোগ্যতার মাপকাঠি এখানে সাজ চাকচিক্য। মেধা এখানে বিফল। এই চিরসত্যি কথাকে মৃণাল সেনের মতো কেউ কি বলতে পেরেছেন?

রমাপদ চৌধুরীর গল্প নিয়ে 'খারিজ' মৃণাল সেনের স্বাদবদলের ছবি। কতকাল আগেই মৃণাল শিশুদের শ্রমকে আইনত দন্ডনীয় বলতে চেয়েছিলেন। এই ছবিতে বালকভৃত্য পালানের মৃত্যু দর্শকের মনে গভীর শোক তৈরী করে। মৃণাল ভাবিয়ে তুলতে চেয়েছেন, মধ্যবিত্ত জীবনে পালানদের শ্রমের বিনিময়ে কি বা পারিশ্রমিক দিতে পারি আমরা? আমাদের বিবেক এখনও ঘুমিয়ে। তিনি এই সুপ্ত বিবেককে সামান্য খোঁচা দিয়েছেন মাত্র।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' অবলম্বনে 'খন্ডহর' ছবিটি অসাধারণ। এই ছবিটি হিন্দী ভাষায় তৈরী। খন্ডহর অর্থাৎ ভগ্ন বিশেষ। ভাঙ্গাচোরা শেষ অবস্থার বাড়ি। নাম এবং জীবন এখানে মিলে মিশে একাকার। ভাঙ্গাচোরা বাড়ির অবশিষ্ট ধ্বংসের মধ্যে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধা ও তাঁর অনূঢ়া কন্যা যামিনীর প্রতীক্ষা এবং অপেক্ষার অবসানের চিত্র হল এই ছবি। বৃদ্ধা মা চিন্তিত, তিনি প্রয়াত হলে কন্যা যামিনীর কি হবে? তাই বারে বারেই যামিনীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন - 'নিরঞ্জন আয়া নিরঞ্জন আয়া'। তাঁর ধারণা একদিন এই খন্ডহরে নিরঞ্জন ফিরে এসে যামিনীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। একজন এসেছে, খন্ডহরে ঘুরে ঘুরে যামিনীর সাহায্য নিয়ে অনেক ছবি তুলে নিয়ে গেছে। একদিন ফিরে আসবে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে। বাস্তব তো তাই বলে কেউ ফিরে আসে না। মহানগরের কলকোলাহলে অজস্র ছবির মধ্যে যামিনীর শীর্ণদীর্ণ ভাঙ্গাচোরা নিষ্প্রভ চোখ দুটি বিলীন হয়ে গেছে। এই ছবিটি খুবই প্রশংসা পায়।

সত্যজিত রায় 'শতরঞ্জকে খিলাড়ি' এবং 'সদগতি' দুটো সিনেমা হিন্দীতে করেছিলেন। তপন সিনহা 'আদমী আউর অউরত' হিন্দীতে করেছিলেন। 'সাগিনা মাহাতো'ও হিন্দীতে হয়। মৃণাল সেন 'একদিন অচানক' হিন্দীতে করেছিলেন। তাছাড়াও প্রেমচাঁদের লেখা 'কাফন' অবলম্বনে 'ওকা উরি কথা' তেলেগু ভাষায় তৈরী করেন তিনি। কিষ্টা-ইয়া, নীলাম্মা ভেংখাইয়া অভাবের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে - তারা সুখ পায় না। সুখ খোঁজেও না। তবে তারা সমাজের মুখোশকে শুধু টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। যারা আসলে কিছু করবে না কিন্তু ভান করে ছল করে দরদ দেখায়, তাদেরই বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ।

মৃণাল সেনের শেষ দিকের ছবি 'আমার ভুবন'। এখানেও দিনমজুরদের গল্প। আত্মপীড়নের যন্ত্রণা। গণনাট্য সঙ্গীত স্রষ্টা সলিল চৌধুরীর বিখ্যাত গান – 'ও আলোর পথযাত্রী' ... এই সিনেমায় ব্যবহার করেছেন মৃণাল সেন। শেষ ছবি পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব বিষয়বস্তু নির্বাচন ক্যামেরা -আলো-সংলাপ-সবই তাঁর নিজস্ব ঘরাণার উত্তম ফসল।

দাদাসাহেব ফালকে, পদ্মভূষণ সহ নানা দেশি বিদেশি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর বহু ছায়াছবি আলোচিত, সম্মানিত হয়েছে।

মৃণাল সেন বেশ কিছুদিন সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালে সেই সময়ের সমাজ -মানুষ-চালচিত্রকে তিনি নিজের মতো করে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার দায়িত্ব নেন সিনেমার মাধ্যমে। তাঁর নিরলস কাজের সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী গীতা সেন। যিনি তাঁর ছবিতে অভিনয়ও করেন।

বড়লোক, বিলাসী, শোষক, পুঁজিপতি মৃণালের চাবুক কাউকে রেয়াত করেনি। তাঁর কলাকুশলীরা বলে - ''কাকে ছেড়ে কাকে মারবেন স্যার? পেটাতে গেলে তো গোটা দেশটাকেই পেটাতে হয়।'' মৃনালের অন্তরের গ্লানি বেদনা যেন এই সংলাপে ঝরে পড়েছে। তিনি চেয়েছিলেন বিপ্লব আসুক দেশ জুড়ে সচেতন নাগরিক সত্তায়। তবে বিপ্লবের রথ যেন পথভ্রষ্ট না হয়। প্রতিকার হোক বা না হোক প্রতিবাদ যেন হয়। অন্যায়কে তিনি কোনওদিন মেনে নেননি। শেষ জীবন পর্যন্ত সবার আড়ালেই থাকতে ভালবাসতেন মৃণাল। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত মুখচোরা মানুষ। কিন্তু মার খাওয়া মানুষদের উঠে বসাবার তাগিদ তিনি প্রতিদিন অনুভব করতেন।

ফরিদপুর পল্লী বাংলায় তাঁর বসত ভিটে। প্রতি বছর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ছুটে যেতেন তাঁর মাটির বুকে। এই নিভৃত অনুভূতি তাঁর একান্তই নিজস্ব। এই মৃণাল সেন যেন একেবারেই অন্য সত্তা। কিন্তু যখন তিনি পর্দায় ছবির কাজ

আরম্ভ করেছেন তখন তিনি গর্জে উঠেছেন নিপীড়ণের বিরুদ্ধে। এ লড়াই তাঁর নিজের সঙ্গে নয় - এই লড়াই কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ সমস্ত মানবিকতাকে জাগিয়ে তোলার লড়াই। সম্মান জিতে নেবার লড়াই। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি শ্যাম বেনেগালের 'অঙ্কুর', নিশান্ত, গোবিন্দ নিহালিনীর 'তমস', এবং 'চক্র' সিনেমাগুলিতে মৃণাল সেনের প্রভাব যেন কোথায় মিলে মিশে রয়েছে। দুর্নীতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে ওঠার জেহাদ। এই প্রতিবাদের ধারাটা যেন অব্যাহত থাকে এটাই তো চেয়েছিলেন শিল্পী মৃণাল সেন। তাই যতদিন সিনেমা বেঁচে থাকবে, মৃণাল সেন মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। কারণ তাঁর চলচিত্রের মূল বিষয় ছিল মানুষ। 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' মৃণাল মানুষ হয়ে তাই মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। শতবর্ষের আলোয় শ্রদ্ধেয় মৃণাল সেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি চিরকাল বহমান হোক।

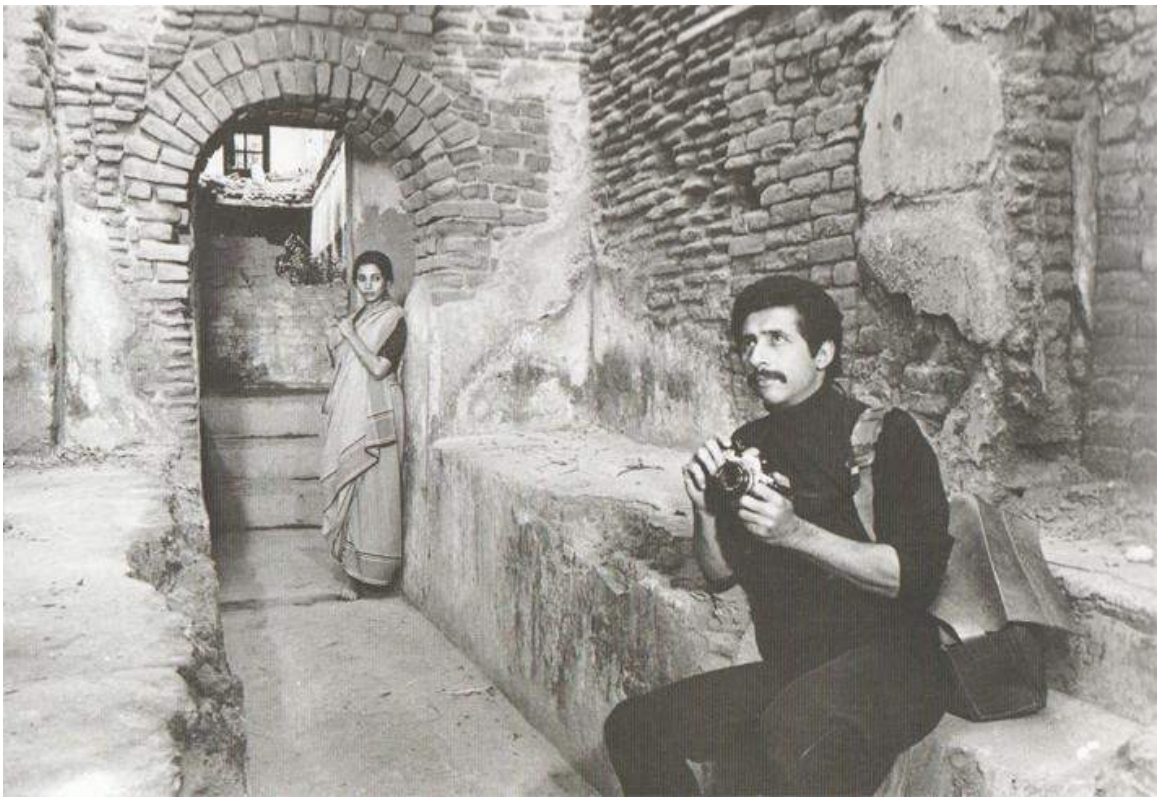

খণ্ডহর : শাবানা আজমি ও নাসিরুদ্দিন শাহ

List of Members of
Mrinal Sen Birth Centenary Celebration Committee

Patrons	:	Prof. Amit Kumar Mallick
	:	Prof. Arabinda Das
	:	Prof. Apurba Mukhopadhyay
	:	Prof. Sibabrata Chattopadhyay
	:	Dr. Tushar Kanti Batabyal
	:	Dr. Subodh Bhattacharyya
	:	Dr. Asok Majumder
	:	Dr. Pradip Kumar Dawn
	:	Sri Siddheswar Acharyya
President	:	Dr. Shorosimohan Dan
Working President	:	Sri Shyamalbaran Saha
Vice-Presidents	:	Dr. Subarna Goswami
	:	Dr. Debesh Thakur
	:	Dr. Sukriti Ghosal
	:	Rev. Dr. G. Paul Arockiam, S.J.
	:	Sri Subhaprasad Nandi Majumder
	:	Dr. Abul Hasan
	:	Dr. Shibaprasad Rudra
	:	Dr. Niranjan Mondal
	:	Dr. Banibrata Goswami
	:	Dr. Gispati Chakraborty
	:	Sri Kashinath Ganguly
	:	Sri Pirdas Mondal
	:	Sri Lalit Konar
	:	Prof. Sahidul Haque
Secretary	:	Sri Bappaditya Dawn
Asst. Secretaries	:	Sri Manab Bandyopadhyay
	:	Dr. Ananya Bhattacharyya

	:	Sri Rishigopal Mondal
	:	Sri Sanjoy Ghosh
Treasurer	:	Sri Arindam Sarkar
General Members	:	Dr. Debidas Mondal
	:	Dr. Ramen Kumar Sar
	:	Dr. Gopa Samanta
	:	Dr. Indrajit Roy
	:	Dr. Gautam Saha
	:	Dr. Mrinal Kanti Ghosh
	:	Dr. Sugata Dasgupta
	:	Dr. Tarashankar Malik
	:	Dr. Sumit Banerjee
	:	Dr. Moloy Rakshit
	:	Smt. Krishna Mukherjee
	:	Dr. Manas Ghosh
	:	Dr. Sujit Chattopadhyay
	:	Dr. Mugdha Sengupta
	:	Dr. Srikanta Samanta
	:	Dr. Aratrika Bhattacharyya
	:	Dr. Enamur Rahaman
	:	Arunava Chakraborty
	:	Taraknath Datta
	:	Ananta Mondal
	:	Purnendu Dey
	:	Thakurananda Pal
	:	Soumen Koner
	:	Subir Kumar Dey
	:	Dibyendu Mukherjee
	:	Barun Sengupta
	:	Debobrata Chakraborty
	:	Dilip Biswas
	:	Nilendu Sengupta
	:	Rangana Dey

: Uday Mukhopadhay
: Subrata Chakraborty
: Shyamaprasad Choudhury
: Narayan Ghosh
: Bidhan Chandra Roy
: Samaresh Roy
: Sukanya Aditya
: Swapnakamal Sarkar
: Pankaj Pathak
: Sirshendu Sadhu
: Sarbajit Jash
: Rangan Kanti Jana
: Goutam Tah
: Shyamsundar Bera
: Abirbhab Bhattacharyya
: Dinesh Jha
: Surya Mondal
: Tapas Makar Biswanath Dey
: Parthapratim Pal
: Sankar Chattopadhyay
: Udayshankar Sengupta
: Santanu Chakraborty
: Pujan Sengupta
: Joyranjan Sen
: Noor Alam
: Nirupam Chowdhury
: Kamal Dutta
: Udit Singha
: Soumyo Bandyopadhyay
: Suprakash Chowdhury
: Debarghyo Dutta
: Gourab Chakraborty

উপসমিতি

অর্থ উপসমিতি

সভাপতি	:	জনার্দন রায়
যুগ্ম আহ্বায়ক	:	অরিন্দম সরকার
	:	অরুনাভ চক্রবর্তী
সদস্য	:	তাপস মাকর
	:	অনন্ত মন্ডল
	:	শীর্ষেন্দু সাধু
	:	সঞ্জয় ঘোষ
	:	দীনেশ ঝা
	:	গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য
	:	কাজল রায়
	:	কমল দত্ত
	:	মন্টু সাহা

সাংস্কৃতিক উপসমিতি

সভাপতি	:	দেবেশ ঠাকুর
যুগ্ম আহ্বায়ক	:	মানব বন্দ্যোপাধ্যায়
	:	অনন্ত মন্ডল
সদস্য	:	উদয় মুখোপাধ্যায়
	:	আরাত্রিকা ভট্টাচার্য্য
	:	উদয়শঙ্কর সেনগুপ্ত
	:	পিয়ালী ঘোষ
	:	ধ্রুবজ্যোতি কেশ
	:	দিলীপ বিশ্বাস
	:	সুব্রত চক্রবর্তী
	:	নীলেন্দু সেনগুপ্ত
	:	পূজন সেনগুপ্ত
	:	অমিতাভ চন্দ্র
	:	প্রবীর হালদার

	:	সমীর রায়
	:	শান্তনু চক্রবর্তী
	:	সুকন্যা আদিত্য
	:	গোপাল রাজ

প্রদর্শনী উপসমিতি

সভাপতি	:	বিশ্বনাথ দে
যুগ্ম আহ্বায়ক	:	শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
	:	পার্থপ্রতিম পাল
সদস্য	:	পূর্ণেন্দু দে
	:	শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী
	:	দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
	:	অনিমেষ চ্যাটার্জী
	:	সৌমেন কোনার
	:	সুবীর কুমার দে
	:	সমরেশ রায়
	:	অনিমেষ চ্যাটার্জী
	:	সুভাষ মন্ডল
	:	তন্দ্রা মুখোপাধ্যায়

স্মরণিকা উপসমিতি

সভাপতি	:	শ্যামলবরণ সাহা
যুগ্ম আহ্বায়ক	:	সুকৃতি ঘোষাল
	:	বিধান রায়
সদস্য	:	তারক নাথ দত্ত
	:	সুজিত চট্ট্যোপাধ্যায়
	:	স্বপ্নকমল সরকার
	:	শিবানন্দ পাল

প্রচার উপসমিতি

সভাপতি	:	সুপ্রকাশ চৌধুরী

যুগ্ম আহ্বায়ক	:	সমরেশ রায়
	:	ঋষিগোপাল মন্ডল
সদস্য	:	তাপস মাকড়
	:	শ্যামসুন্দর বেরা
	:	পার্থপ্রতিম পাল
	:	রঙ্গনা দে
	:	কিশোর মন্ডল
	:	নিরুপম চৌধুরী
	:	উদিত সিংহ
	:	সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়
	:	শঙ্কর পালিত
	:	গৌরব চক্রবর্ত্তী

সেমিনার উপসমিতি

সভাপতি	:	সন্তোষ পাল
আহ্বায়ক	:	অনন্য ভট্টাচার্য্য
সদস্য	:	সত্যদর্শন দত্ত
	:	পঙ্কজ পাঠক
	:	সর্বজিৎ যশ
	:	রঙ্গনকান্তি জানা
	:	গৌতম তা
	:	ইনামুর রহমান।